জয়তু নেতাজী

- স্বামী দিব্যনাথানন্দ

সেটা ১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর। দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার শুরু হয়েছে। সারা দেশ তখন উত্তাল, জায়গায় জায়গায় মিটিং- মিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা গোপন রেখেছিল, কিন্তু এই সামরিক আদালত শুরু হবার সাথে সাথে দেশের মানুষ তাদের কথা শুনল, জানল। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল দেশ, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ এক সুরে দাবী জানাল, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হোক। শুধু তাই নয়, রয়াল ইন্ডিয়ান নেভীতেও বিদ্রোহ দেখা দিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে এই সমস্ত বিদ্রোহে কর্ণপাত না করলেও, পরে সমগ্র দেশব্যাপী বিক্ষোভের ফলে এই বিচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়, ও আজাদ হিন্দ সৈনিকদের মুক্ত করা হয়।

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অমর জীবনের কিছু দিক উন্মোচিত করব ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গড়ে ওঠার কাহিনিও বলব।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব

কটকে থাকাকালীন সুভাষের বয়স যখন তেরো-চোদ্দ তখন তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বই চোখে পড়ে। বইগুলি পড়তে শুরু করলেন তিনি। একটু উলটে পালটেই বুঝলেন, এমন একটা জিনিস তিনি পেয়েছেন, যা অনেক দিন ধরেই তিনি খুঁজছিলেন।তাঁর নিজের ভাষায় "কয়েক পাতা উলটেই বুঝতে পারলাম, এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল, দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর মধ্যে আমার জীবনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম।" বিবেকানন্দ রচনাবলী পড়ার পর তাঁর জীবন একটি নতুন খাতে বইতে শুরু করে। স্বামীজী প্রচারিত 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে তিনি তাঁর ভাবী জীবনের ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। শুরু হল তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন। খুব ভোরে উঠে নিয়মিত ধ্যান অভ্যাস করতেন, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের নিয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। পড়াশুনায় একটু অমনোযোগী হয়ে পড়লেন সুভাষ। আত্মীয়স্বজনরা সাবধান করতে চাইলেন, কিন্তু স্বামীজীর ভাবে তিনি তখন রীতিমত মেতে গিয়েছেন। সেই জোয়ারে বড়দের বিধিনিষেধ ভেসে গেল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন তিনি।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সুভাষচন্দ্র কলকাতায় আসেন পড়াশুনার জন্য, তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য সুদূর ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন, সেখানে আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ গভর্মেন্টের চাকরি করবেন না বলে আই সি এস প্রত্যাখ্যান করলেন। এতদিনে স্থির করে ফেলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবেন ও সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেবেন। তাই বিলেত থেকে ফিরেই দেখা করলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। গান্ধীজী তাঁকে পাঠালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে। সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির হাতেখড়ি দেশবন্ধুর কাছেই। কিন্তু বেশ কয়েক বছর কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করে বুঝলেন, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অসম্ভব, অথচ দেশের তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজীর অহিংসার পথেই চলার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন, দেশের বাইরে গিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করে, বাইরে থেকে ব্রিটিশের উপর আঘাত করার জন্য।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দেশ, যেমন- মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মা, ভিয়েতনাম ইত্যাদিতে বহু ভারতীয়দের বাস ছিল। এ সব দেশ ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের শাসনে থাকার ফলে, তাঁদের সেনাবাহিনীতে বহু ভারতীয় সৈনিকও ছিলেন। ধীরে ধীরে জাপান এসমস্ত দেশকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয়দের দখল থেকে মুক্ত করে। কর্নেল মোহন সিং, ও রাসবিহারী বোস ভারতীয় যুদ্ধপরাধীদের নিয়ে, জাপানীদের সাহায্যে তৈরি করেন Indian National Army বা আজাদ হিন্দ ফৌজ। যদিও জাপানীদের সঙ্গে নানা মতভেদের কারণে, আজাদ হিন্দ ফৌজ সাময়িক ভাবে ভেঙ্গে যায়, পরে নেতাজীর নেতৃত্বে তা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়।

রাসবিহারী বসু ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে বহু বাধা অতিক্রম করে জাপানে এসে পৌঁছান। ভারতবর্ষ থেকে যে সমস্ত বিপ্লবীরা জাপানীদের কাছে আশ্রয় পান, তাঁরা রাসবিহারী বসুকে তাঁর ব্যক্তিত্ব, গভীর দেশপ্রেম, অসীম সাহস ইত্যাদি গুণে নিজেদের নেতা বলে গ্রহণ করেন। তাছাড়া জাপান ইম্পিরিয়ল আর্মি ও জাপানী সরকারের উপরও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাই, ১৯৪১এ এশিয়া অঞ্চলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হবার আগে রাসবিহারী বসু জাপানের সামরিক বাহিনী থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, যে সমস্ত ভারতীয়রা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন তাদেরকে শত্রুপক্ষ বলে গণ্য করা হবে না এবং তাঁরা নিজেদের দেশ ভারতবর্ষের মুক্তির উদ্দেশ্যে নিজেদের সংগঠিত করতে পারবেন।

১৯৪২ এ সিঙ্গাপুরের পতনের পর, যখন ব্রিটিশরা জাপানীদের কাছে পরাজিত হল, ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে কর্নেল হান্ট ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয়দের, মেজর ফুজিয়ারার হাতে তুলে দেন, যিনি আবার কর্নেল মোহন সিং-এর হাতে তাঁদের হস্তান্তর করেন।

এখন একটি নতুন সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্ত ভারতীয় সৈনিকদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশদের সেনাবাহিনীতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছিলেন। তাঁরা অনেকেই বংশ পরম্পরায় সেই কাজে বহাল থাকার দরুন, ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। তাছাড়া তাঁরা মোহন সিং ও রাসবিহারী বসুর নামের সঙ্গে তেমন পরিচিত ছিলেন না। রাজনৈতিক সচেতনতা যাঁদের ছিল, তাঁরা জাপানীদের তেমন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যাইহোক, মোহন সিং, রাসবিহারী বসু ও অন্যান্য নেতারা মিলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের সংগঠিত করে একটি স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী গড়ার পরিকল্পনা করতে থাকেন। ব্যাংককে ভারতীয়দের একটি বিশাল সম্মেলনে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্ম হল। যদিও তা জাপানীদের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছিল, তাঁরা আশা করেছিলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি স্বতন্ত্র সেনাবাহিনীর স্বীকৃতি পাবে, কিন্তু জাপানীদের কাছ থেকে তাঁরা তেমন স্বীকৃতি পেলেন না, এইসব কারণে জাপানীদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তাদের মতবিরোধ শুরু হতে থাকে। বিশেষ করে মোহন সিং বুঝলেন, জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করতে চাইছে। মোহন সিং সিদ্ধান্ত নিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে দেওয়া হোক। তাঁর এই সিদ্ধান্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ সৈনিকরা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁদের বক্তব্য, আজাদ হিন্দ ফৌজ কোন ব্যক্তির স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি। এদিকে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে ক্ষোভের আঁচ পেয়ে জাপানীরা বুঝল, আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি সামান্য জিনিস নয়। যদি সত্যি তাঁদের উদ্দেশ্য হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা জাপানী সেনাদের পাশাপাশি লড়ুক, তাহলে তাঁদের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দিতেই হবে। আগেই ঠিক হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে সুভাষ চন্দ্র বসুকে জার্মানী থেকে জাপানে নিয়ে আসার। এখন জাপানীরা তা কার্যকরী করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতে থেকে বুঝেছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ব্রিটিশদের ভারত থেকে উচ্ছেদ করার আর কোনও উপায় নেই। গান্ধীজীর অহিংসার নীতি তাই তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন, ভারতের বাইরে গিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার। তাঁর প্রথম নজর ছিল জার্মানীর সর্বাধিনায়ক এবং ব্রিটিশ শত্রু হিটলারের দিকে। তাঁর যুক্তি ছিল, আমাদের দেশের শত্রুর শত্রু আমাদের দেশের বন্ধু। জার্মানীতে অনেক ভারতীয় যুদ্ধাপরাধী ছিলেন যারা উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত। ব্রিটেন অক্ষশক্তি দ্বারা পরাজিত হলে সেইসব ভারতীয়রা যুদ্ধাপরাধী হয়ে জার্মানীতে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তাদের সংগঠিত করে সুভাষচন্দ্র ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার গড়ে তোলেন।

কিন্তু হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিটলারের সেরকম আগ্রহ নেই। এদিকে, সিঙ্গাপুরে জাপানীদের যুদ্ধে জয়লাভের খবর পেয়ে তিনি যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। অন্যদিকে, রাসবিহারী বসু প্রমুখ আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তারা সুভাষচন্দ্র বোস সম্বন্ধে আগেই শুনেছিলেন, তাঁরা আহ্বান জানালেন সুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার জন্য।

২রা জুলাই, ১৯৪৩ এ সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছান সুভাষ, আর ঠিক দু দিন পর, ৪ঠা জুলাই, রাসবিহারী বসু সেখানে ভারতীয় নাগরিকদের বিশাল জনসমাবেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য ভার সুভাষ চন্দ্রের হাতে তুলে দেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাধ্যক্ষ হবার পরই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সে বছরই তিনি একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন যার নামকরণ করা হয় আর্জি হুকুমত-এ আজাদ হিন্দ Provisional Government of Free India, অথবা আজাদ হিন্দ সরকার। এই আজাদ হিন্দ সরকার অক্ষশক্তির সমস্ত দেশের স্বীকৃতি পেয়েছিল। নেতাজীর গভীর দেশপ্রেম, ওজস্বিনী ভাষণ, ব্যক্তিত্ব ও অনলস পরিশ্রম আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা ও এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের মনে নতুন বল এনে দিয়েছিল। নেতাজী তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে বার বার বলছিলেন যে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা অবশ্যই তাঁরা ভারতবর্ষের মাটি থেকে ব্রিটিশদের মূলোচ্ছেদ করতে পারবেন। বহু ভারতীয়রা বিপুল ভাবে নেতাজীর 'দিল্লী চলো' 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব', এই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাবাহিনীতে স্থান পাওয়া তাঁদের কাছে একটি গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক ভারতীয়দের বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার ছবির সঙ্গে নেতাজীর ছবিও দেওয়ালে শোভা পেত। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, অমানুষিক সাহস ও মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার জন্য তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ভালবাসার গুণেই তিনি সেই সব ভারতীয়দের একটি ছত্রছায়ার নিচে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর ওজস্বিনী ভাষণের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতাই যে তাঁর একমাত্র জীবনব্রত তা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং শুধু তাই নয়, এশিয়াবাসী সমস্ত ভারতীয়দের অন্তরেও মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসা পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে, আজাদ হিন্দ ফৌজে দলে দলে লোকেরা যোগ দিতে থাকে। অনেকে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ দান করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ফাণ্ডে। এমন বহু মানুষ ছিলেন, যারা অর্থ দান করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

নেতাজী হিসেবে তিনি সর্বাধিনায়ক হলেও ব্যক্তি হিসেবে তিনি সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। তাঁর জীবনে বিলাসিতার কোন স্থান ছিল না। সেনাদের সঙ্গে একই রকম খাবার খেতেন এবং অনেক সময় কাজের অবসরে টেনিস খেলে অন্যদের আনন্দ দিতেন। মহিলাদের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজে তিনি আলাদা রেজিমেন্ট গঠন করে নাম দেন 'রানী লক্ষীবাই রেজিমেন্ট' এবং লক্ষী স্বামীনাথন কে তার নেত্রী করেন। মহিলা সৈনিকদের কাছে তিনি পিতার মতো ছিলেন এবং দুঃখকষ্টে তাদের ভার লাঘব করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন। একবার লক্ষীবাই রেজিমেন্টের কোন নারী স্বামীহারা হলে, সহ্য করতে না পেরে তিনি বিষ গ্রহণ করেন। তাড়াতাড়ি সবাই তা জানতে পেরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তিনি প্রাণে রক্ষা পান। নেতাজীরই নির্দেশে আর একজন নারী সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে থেকে তার পরিচর্যা করতে থাকেন।

যদিও জাপানীরা নেতাজীকে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনই মনে করতেন না জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর কর্তৃত্ব করবে। তাঁর ভাব ছিল, উভয় উভয়কে একই লক্ষ্যে সহায়তা করছে। একবার জাপানী কোন অফিসার বলে পাঠান, আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন সৈনিক জাপানী সেনার একই পদের সৈনিকের সঙ্গে দেখা করতে এলে, আগে আজাদ হিন্দ সৈনিক স্যালুট করবে জাপানী সৈনিককে। কিন্তু নেতাজী কঠোর ভাবে এর বিরোধিতা করে বলে পাঠালেন, জাপানীরা আমাদের প্রভু নয়। আমরা স্বাধীন সেনাবাহিনী। জাপানীরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে সেই নিয়ম তুলে নেয়। নেতাজী মিটিং-এ স্পষ্ট করে বলতেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ কে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতেই হবে ও তাঁরা যেন খুব বেশি জাপানীদের উপর নির্ভরশীল না হন। ব্রিটিশদের পরাজিত করার পর যদি জাপানীরা ভারতীয়দের পদদলিত করার চেষ্টা করে তবে ব্রিটিশদের পরাজিত করে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাঁরা যেন পিছপা না হন।

নেতাজীর যে কোনও ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না এবং তাঁর নিজের দৃষ্টিতে তিনি মাতৃভূমির একজন সৈনিক মাত্র ছিলেন তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। একবার একটি মিটিং-এ জেনারেল তোজো মন্তব্য করে বসলেন, ভারত স্বাধীন হলে নেতাজীই হবেন সর্বময় কর্তা। নেতাজী উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বললেন, তোজোর এরকম মন্তব্য করবার কোনও অধিকার নেই, কেননা ভারত স্বাধীন হলে ভারতের জনগণই ঠিক করবে কে সর্বময় কর্তা হবেন। আর একটি বিশেষ গুণ যার জন্য তিনি সবার মন জয় করতে পেরেছিলেন, তা হল, তিনি জাতি-ধর্মের উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম-শিখ সমস্ত ধর্মের মানুষ আজাদ হিন্দ ফৌজে স্থান পেয়েছিল এবং সমান মর্যাদা পেয়েছিল।

নিম্নে উল্লিখিত ঘটনাটি এই ভাবের পরিচয় প্রদান করে -

ব্রিজলাল জয়সোয়াল নামে একবার এক ধনী গুজরাটী ব্যবসায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য কিছু অর্থ দান করতে আসেন। সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার মন্দিরের পক্ষ থেকে তিনি এসেছিলেন। নেতাজী তাঁকে আপ্যায়িত করার পর জানতে চাইলেন, অর্থের দান হিসাবে চেক তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দেবেন, না চেট্টিয়ার মন্দিরের পক্ষ থেকে দেবেন। জয়সোয়ালজী জানান, চেট্টিয়ার মন্দিরের পক্ষ থেকেই দেবেন, কিন্তু তাঁদের অনুরোধ, একবার মন্দিরে নেতাজীকে আসতে হবে। নেতাজী সে প্রস্তাবে রাজি হতে পারলেন না। বললেন, সুভাষ বোস হিসাবে তিনি যেতে পারেন, কিন্তু নেতাজী হিসেবে যেতে পারবেন না। আর কোনও অর্থও তিনি দান হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন না। জয়সোয়ালজী মাথা নত করে চলে গেলেন। পাশে থাকা নেতাজীর এক সহকারী বলে উঠলেন, মনে হচ্ছে কয়েক লক্ষ টাকার একটি অনুদান ফস্কে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন নেতাজী, মনে রাখবে, তোমাদের নেতাজীর বিবেকের দাম কয়েক লক্ষ টাকার চেয়েও অনেক বেশী।

পর দিন আবার চেট্টিয়ার মন্দিরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নেতাজীকে সেখানে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে আসেন। নেতাজী কিন্তু বললেন, উনি একা যাবেন না, সঙ্গে কয়েকজন সহকারীও যাবেন, যারা খ্রীস্টান ও মুসলিম। সেই মন্দিরের পুরোহিতরা তাতে অবশ্য রাজী হয়েছিলেন এবং নেতাজী সেখানে সহকারীদের নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা আগেই আলোচনা করেছিলাম, নেতাজী বাল্যকালেই স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ে তাঁর দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে, তাঁরই আদর্শে নিজ জীবন গঠন করেন। সিঙ্গাপুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি শাখা-কেন্দ্র আছে, নেতাজী সেখানে মাঝে মধ্যে যেতেন, কখনো সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দ মহারাজকে নিজ বাসভবনে নিমন্ত্রণ করতেন। প্রথম যেদিন মহারাজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, নেতাজী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন ও তাঁকে বসিয়ে আশ্রমের কাজ কর্মের কথা জানতে চাইলে ভাস্বরানন্দজী সংক্ষেপে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কার্যের বিবরণ দেন। নেতাজী তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। যখনই মহারাজ নেতাজীর কাছে যেতেন, তিনি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন ও রাতের খাবার না খাইয়ে আসতে দিতেন না।

একবার ভাস্বরানন্দ মহারাজ নেতাজীকে মা সারদা দেবীর জন্মদিনে আশ্রমে আসার নিমন্ত্রণ জানান। নেতাজী যথাসময়ে এসে মন্দিরে প্রায় একঘণ্টা ধ্যান করে, প্রসাদ পেয়ে ফিরে যান। আসবার আগে শ্রীশ্রী চণ্ডী বইটি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করলে, নতুন কোন কপি না থাকার জন্য মহারাজ তাঁর নিজের বইটি নেতাজীকে উপহার দেন।

নেতাজী সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আশ্রমের সেবামূলক কাজের জন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার তিনি নিজ তহবিল থেকে দান করেন, ও আরও পঞ্চাশ হাজার সংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন। আশ্রমের ছাত্রাবাস তাঁর দ্বারাই উদ্বোধন হয়।

আমরা আগেই বলেছি, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাঁর জীবনী লেখা নয়। আমরা তাঁর গভীর দেশপ্রেম, অসাধারণ চরিত্র ও বীর্যবত্তা, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে এগিয়ে দেওয়ার কথা তুলে ধরলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ জাপানীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করার ফলে, পাশাপাশি আজাদ হিন্দ ফৌজও যে

লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, তাঁরাও পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফলে, তাঁরা ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হয়ে যুদ্ধাপরাধী হন। কিন্তু পরে যখন দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক আদালতে তাদের বিচার শুরু হল, তখন সমস্ত দেশ তাদের কথা জানতে পারল ও দেশব্যাপী বিদ্রোহ দেখা দিল।

বিক্ষোভের ফলে ব্রিটিশ সরকার বুঝল, ভারতকে আর শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা যাবে না। তারপর যা ঘটেছিল, তা ইতিহাস। ১৫ই আগস্ট বৃটিশ শাসন মুক্ত হয়ে ভারত স্বাধীন হল, দিল্লীর লাল কেল্লার মাথা থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেশের বাইরে গিয়ে সামরিক বাহিনী গঠন করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার, তা বহু বাধা অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত সাফল্য লাভ করেছিল যা ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। ■

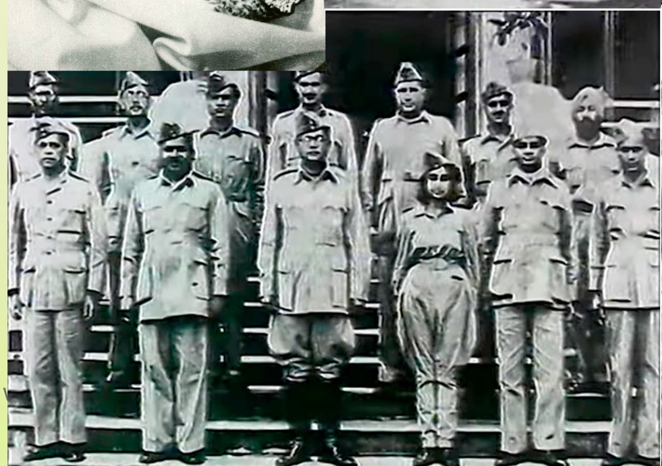

একটি কবিতার শতবার্ষিকী
- 'বিদ্রোহী' কবিতা ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম

- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

'বিদ্রোহী' কবিতা ও কবি - পটভূমিকা

"বল বীর -
বল উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমারি নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!"

একটি কালজয়ী বাংলা কবিতার শুরু এইভাবে। সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রই জানবেন কবিতাটির নাম 'বিদ্রোহী', রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম। এটি রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের শেষের দিকে, তাই এই বছর কবিতাটির বয়স হ'ল এক শ' বছর।

বাইশ বছর বয়সের অজ্ঞাত-পরিচয় এক দরিদ্র বাঙ্গালী যুবক কলকাতা শহরের ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা। নাম কাজী নজরুল ইসলাম। এক-কামরার বাসস্থানটিও তাঁর একার নয়, সঙ্গী আর এক বাউন্ডুলে, সে আবার কম্যুনিস্ট পার্টি করে। নাম মুজফ্‌ফর আহমেদ, যার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল করাচি থেকে লেখা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। সাল ইংরেজির ১৯২১, ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজধানী যদিও সরিয়ে দিল্লী নিয়ে গেছে বছর দশেক আগেই, কলকাতা কিন্তু রয়ে গেছে শাসক-বিরোধী কার্য্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে। স্বাধিকার অর্জনের চলমান সংগ্রামের এক সাহসী সৈনিক নজরুল ইসলাম, যদিও তাঁর অস্ত্র লেখনী। 'রক্ত ঝরাতে পারি নে ত একা/ তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা', তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি। স্বল্প পরিসরে কবির পরিচিতি ও 'বিদ্রোহী' কবিতাটির কয়েকটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য।

নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালের ২৪ শে মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬)। পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে নজরুলের নিয়মমাফিক প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার সুযোগ হয় নি। পাড়ার মক্তবে এবং আশপাশের দু-একটি স্কুলে তিনি কয়েক বছর পড়েছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেও মসজিদে বা রুটির দোকানে কাজ করে রোজগারের চেষ্টা তাঁকে নিয়মিত করতে হত। তিনি ছিলেন ঝাঁকড়া চুলের বলিষ্ঠ সুদর্শন কিশোর। অভাবের তাড়নায় ১৭ বছরের নজরুল ৪৯ নম্বর বাঙ্গালী রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে 'হাবিলদার' হিসেবে করাচি চলে যান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, ১৯১৭ সালে।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালের শেষের দিকে। পরের দুটি বছর ভারতের রাজনীতি জগতের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৯ এর ১৩ই এপ্রিল ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড। কয়েক শ' নিরস্ত্র প্রতিবাদী মানুষ জনৈক জেনারেল ডায়ারের হুকুমে, পুলিসের গুলিতে, প্রাণ হারান বা জখম হন। এই স্পর্ধিত বর্বরতার বিরুদ্ধে একক প্রতিবাদ জানান রবীন্দ্রনাথ। মার্জিত কিন্তু জ্বালাময়ী ভাষায় লেখা একটি চিঠিতে কবি বিদেশী শাসককে ধিক্কার জানিয়ে তাঁর নাইটহুড পদবীটি ফিরিয়ে দেন। ১৯২০ সালে গান্ধীজী ডাক দেন দেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সাফল্য নজরুল, মুজফ্‌ফরদের মত তরুণ বামপন্থীদের বুকে আশা সঞ্চার করে। নজরুল সফল বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছিলেন তাঁর 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি।

হাবিলদার থেকে কবি - 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্মকথা ও যশোগাথা

১৯১৯ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ নজরুল করাচি থেকে বাংলায় ফিরে আসেন। মায়ের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে নজরুল এলেন কলকাতায় তাঁর গ্রামের সহপাঠী বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ওরফে শৈলের মেসে থাকবেন বলে। মেসের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে দিনের আহারাদি সারার পর আবিস্কার হল নবাগতটি মুসলমান। শৈল সহ নজরুল মেস থেকে পত্রপাঠ বিতাড়িত হলেন। শৈল গেলেন মামার বাড়ি আর নজরুলের মাথার ওপর ছাদ জুটল 'পেন-ফ্রেন্ড' মুজফ্‌ফরের ডেরায়। এইভাবে শুরু হল দুই ব্যতিক্রমী বাঙ্গালী মুসলমান যুবকের আদর্শভিত্তিক ঘটনাবহুল দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন। একজন ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অগ্রপথিক, অন্যজন এক দিকে বিদ্রোহী, আর অন্যদিকে কবি, সাহিত্যিক, সুরকার, গাইয়ে এবং প্রেমিকও।

আরও দু-একটি বাসা পাল্টে নজরুল ও মুজফ্‌ফর এলেন ৩/৪ সি তালতলা লেনের ছোট একটি ঘরে। ১৯২১ সালের শেষের দিকে, এক শীতের রাত্তিরে, মুজফ্‌ফর শুয়ে পড়েছেন আর তাঁর বন্ধুটি টেবিলে বসে এক মনে লিখে চলেছেন। সকালে ঘুম ভাঙতে নজরুল জানালেন তিনি একটি কবিতা লিখেছেন। এলোমেলো ভাবে ছড়ানো বেশ কয়েকটি কাগজ একসঙ্গে করে তিনি পেন্সিলে লেখা লম্বা কবিতাটি পড়তে শুরু করলেন। মন দিয়ে শোনার পর স্বল্পভাষী মুজফ্‌ফর শুধু বললেন 'কাগজে ছাপ'। নজরুল হয়ত খানিকটা হতাশ হলেন।

'বিজলী' নামের মোটামুটি নামকরা একটি সাহিত্য পত্রিকার পরিচালক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নজরুলের পরিচিত 'অবিদা'। তিনি নজরুলের কাছে লেখা চেয়ে রেখেছেন। কবিতাটি নিয়ে নজরুল গেলেন তাঁকে শোনাতে। হাজির হয়ে 'অবিদা শোন' বলে, হাত-পা নেড়ে, নজরুল পড়ে গেলেন। সযত্নে কবিতাটিকে রক্ষা করার প্রয়োজন বুঝে অবিদা প্রথমেই চাইলেন কালিতে এবং ভাল কাগজে এটিকে লিখে নিতে। নজরুল পড়ে গেলেন আর তাঁর অবিদা টুকে নিলেন। শেষ হলে নামহীন এই কবিতাটির নাম দেওয়া হল 'বিদ্রোহী'। নজরুল ছিলেন 'মোসলেম ভারত' নামের অন্য একটি সাহিত্য পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তিনি চাইলেন কবিতাটি সেখানে ছাপাতে, অথচ অবিদাও এ রত্নটিকে হাতছাড়া করতে নারাজ। তিনি নজরুলকে বোঝালেন 'মোসলেম ভারত' ত্রৈমাসিক পত্রিকা আর 'বিজলী' সাপ্তাহিক, তাই কবিতাটি পরের সংখ্যায়, পরের দিনই, প্রকাশ করতে পারবে। তাঁরই জয় হল। পরের দিন ২২শে পৌষ ১৩২৮ (৬ জানুয়ারী ১৯২২) 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' প্রথম জনসমক্ষে এল এবং পাঠকমহলে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করল। একই সপ্তাহে 'বিজলী' দ্বিতীয়বার ছাপতে হ'ল

এবং দু'বারে মোট ঊনত্রিশ হাজার কপি ছাপা হল। এর পরের কয়েক মাসে 'মোসলেম ভারত' সহ কলকাতার আরও চারটি সাহিত্য বা সংবাদ পত্রিকা কবিতাটি ছাপে এবং প্রত্যেকটিই, পাঠকের চাহিদায়, দ্বিতীয়বার ছাপা হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি কবিতার এই ধরণের বিপুল জনপ্রিয়তা বোধহয় নজিরহীন। রাতারাতি এই ২২ বছর বয়সের কবি হয়ে উঠলেন বাঙ্গালীর পরিচিত নাম।

কবিতাটিতে 'আমি' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ১৪৩ বার, 'বিদ্রোহী' সাতবার। এ কবিতার শব্দচয়ন ও ছন্দের দোলা বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র-উদ্ভাসিত যুগেও একটি নতুন ধারার সূচনা করেছিল বলা যায়। কবিতাটির অনেকগুলি বিশেষত্বের মধ্যে একটি হ'ল হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় ও পৌরাণিক চরিত্র, কাহিনী, উপমা বা চিত্রকল্পের ব্যাপক ব্যবহার। যেমন -

"আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার।"

অথবা

"আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া
ভয়ে সপ্তনরক, হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।"

"আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।"

কবিতাটি বিদ্রোহ ঘোষণা করছে অত্যাচার, অবিচার, স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে। মানবাধিকার বঞ্চিত নতশির মূক মানুষের হয়ে দাবী করেছে মনুষত্বের মর্য্যাদা। এমন কি সৃষ্টিকর্তা বিশ্ববিধাতাও রেহাই পান নি বিদ্রোহীর রোষানল থেকে -

"আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিব পদচিহ্ন
আমি স্রষ্টাসূদন শোকতাপহানা খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।"

বিদ্রোহী কবি জানালেন –

"আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।"

কবি কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভুতি-বিমুখ সাধক ন'ন, বা মায়া-মমতা-বিহীন বিদ্রোহী ন'ন। তাঁর মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের পূজারী। তিনি প্রেম, ভালবাসায় সিক্ত প্রেয়সী-সঙ্গের জন্য উদগ্রীব। তিনি জানাচ্ছেন -

"আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধহিয়ার কাতরতা, ব্যাথা-সুনিবিড়,
চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন, আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কনকন।"

পাঠক মহলে প্রতিক্রিয়া

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘ সময় ধরে কবির এবং তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার মূল্যায়ন ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সূচক রচনাদি প্রকাশিত হয়। কবি বুদ্ধদেব বসু বললেন 'এমন কবিতা আগে কখনও পড়িনি।' অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'এ কে নতুন কবি? নির্জীব দেশে এ কার বীর্যবাণী?'

কিন্তু বাঙ্গালী চরিত্রের স্বাভাবিক ঈর্ষা-সঞ্জাত নিন্দা-প্রবৃত্তি, যা রবীন্দ্রনাথকে পরিণত বয়সেও তাড়া করে বেড়িয়েছিল, তা নজরুল বা তাঁর কবিতাকেও রেহাই দিল না। 'শনিবারের চিঠি' সাহিত্য পত্রিকার সজনীকান্ত দাস লিখলেন তাচ্ছিল্যে ভরা প্যারডি, নাম 'আমি ব্যাঙ'।

'আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং
আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই
আমি বুক দিয়া হাঁটি, ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।'

কাজী নজরুলের নাম বিকৃত করে করা হ'ল গাজী আব্বাস বিটকেল। নজরুলও ছেড়ে কথা বলার মানুষ ন'ন। তিনি সজনীকান্ত দাসের নাম দিলেন 'সজনে ঘণ্ট ঘাস'।

কবি গোলাম মোস্তাফা 'নিয়ন্ত্রণ' নামে কবিতায় লিখলেন -

'ওগো বিদ্রোহী বীর! সংযত কর, সংহত কর উন্নত তব শির' ইত্যাদি

আর নজরুলের গুরুতুল্য একদা একান্ত ভক্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে বচসার জেরে বাক্যালাপই বন্ধ হয়ে গেল। অচেনা তরুণের লেখা একটি কবিতা পাঠক মহলে কি পরিমাণ আবেগের বৈপরীত্ব সৃষ্টি করতে পারে এ গুলি তার পরিচয় বহন করছে।

নিন্দা-প্রশংসার কষ্টিপাথরে যাচাই যখন এইভাবে চলছে তখন নজরুলের পক্ষে রায় এল, বলা যায় অপ্রত্যাশিতভাবেই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুল জেলে গেছেন ১৯২২ সালে। জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য নিত্য বরাদ্দ থাকত নানা লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। এর প্রতিবাদে নজরুল আলিপুর জেলে অনশন শুরু করেন। উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম পাঠালেন "give up your hunger strike, our literature claims you"। তাঁর সদ্য-রচিত 'বসন্ত' নাটিকাটি নজরুলকে উৎসর্গ করলেন "শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু" এই মর্মে। বাংলা ভাষার মহাকবির কাছে পাওয়া এই কবি-স্বীকৃতি নজরুলকে নিশ্চয়ই স্বস্তি দিয়েছিল।

এ কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতাটির জন্যই নজরুল বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত অমর হয়ে থাকতেন, ইংরেজি সাহিত্যে টমাস গ্রে যেমন তাঁর 'এলিজি' কবিতা বা কোলরিজ যেমন তাঁর 'এন্সেন্ট মেরিনার' কবিতার জন্যই বিশেষভাবে পরিচিত।

এই গেল কবি নজরুলের কথা। ব্যক্তি নজরুল সম্পর্কে অল্প কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল দু'জনেই ছিলেন স্কুল-ছুট, স্ব-শিক্ষিত। শেক্সপীয়রের মত তাঁরাও ছিলেন ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষায় "self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secure"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত 'সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর পাঠশালা পলায়ন' ছিল রোমান্টিকতার, আর রুটির দোকানের বালক-কর্মচারী নজরুলের স্কুল-কামাই বাধ্যবাধকতার।

তাঁর লেখায় এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে হিন্দু, মুসলমান উভয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর ও সশ্রদ্ধ পরিচিতির যে সন্ধান পাওয়া যায় তা রীতিমত বিস্ময়কর। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত প্রায় চার শ' ভক্তিমূলক গানের মধ্যে এক শ'র ওপর হিন্দু ধর্মের কাহিনী বা দেব-দেবী নিয়ে, যার মধ্যে শ্যামা-সংগীতের পরিচিতি ব্যাপক। এই শ্রদ্ধাবোধ নজরুলকে সঙ্কীর্ণ ধর্ম-বিশ্বাসের ঊর্ধে এক মানবসত্তায় উন্নীত হতে সাহায্য করেছিল। তাঁর সংস্কৃতি ছিল খাঁটি বাঙ্গালীর, শুধুমাত্র হিন্দুরও নয় বা শুধুমাত্র মুসলমানেরও নয়। আজকের দেশে বিদেশে ধর্ম-ভিত্তিক বিভাজনের আবহাওয়ায় নজরুলের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব তাই দৃষ্টান্তব্যঞ্জক, বিশেষত আমাদের মত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে।

১৯৪৭ এ ধর্মভিত্তিক বঙ্গভঙ্গের সময় নজরুল-সুহৃৎ অন্নদাশঙ্কর রায় সখেদে লিখেছিলেন –

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয় নি কো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক
বাঙ্গালী আছেন একজন,
দুর্গতি তার ঘুচে যাক।"

নজরুল তখন রোগজীর্ণ, রুদ্ধবাক, পঙ্গু। যেন ধর্মের নামে সদ্য-দ্বিখণ্ডিত বাংলার অচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক সত্তার প্রতীকী মৌন রূপ। ■

সাপ্পোরো বাস

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

বাড়ি থেকে হেঁটে ২০ মিনিটে পৌঁছানো যায় মারুয়ামা পাহাড়ের পাদদেশে। পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২২৫ মিটার। আবালবৃদ্ধবনিতা, যে কেউ অনায়াসে চড়ে যেতে পারে পাহাড়টির মাথায়। এমন কি ক্লাস ওয়ানের শিশুরাও নাকি বেড়াতে যায় সেখানে পিকনিক করতে। জীবনে কখনো পর্বত আরোহণের সখ হয় নি। তবে এমনটা শুনে কৌতূহল হল। ভাবলাম, বাড়ির কাছে যখন, একবার ঘুরে এলে মন্দ হবে না। তাই জুন মাসে একদিন গায় সাধারণ জামা ও পায় সাধারণ জুতো পরে রওনা হলাম।

পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করার পরপরই জানতে পারলাম, যতটা শুনেছিলাম, ততটা সহজ নয় এই অভিযান। খাড়া ও পিছল পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে উঠতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। মনে মনে অভিশাপ দিয়ে বললাম যে 'আবালবৃদ্ধবনিতা' কথাটা থেকে বৃদ্ধের অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল। তবে পাহাড়ি পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে প্রায় এক ঘণ্টার মাথায় কোনো রকমে যখন চূড়ায় পৌঁছাই, তখন বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। চোখের সামনে সাপ্পোরো শহরের প্যানোরামিক ভিউ-এর বিস্তার! দারুণ দৃশ্য! অত্যন্ত মনোরম দৃশ্যের পাশাপাশি ঢালু পথ যেতে যেতে দেখা বিভিন্ন রকমের গাছপালা ও বন্য প্রাণীরাই ছিল অন্য আকর্ষণ। পুরো মারুয়ামা পাহাড়টি ঘন অরণ্যে আচ্ছাদিত, যেন সবুজ রঙের আঁচল বিছিয়ে আছে পাহাড়ের গায়। প্রাচীনকাল থেকে এই বনের অবস্থান যেখানে, সেখানে মানুষের হাত কদাচিৎ পড়েছে। যুগ যুগ ধরে জাপান সরকারের উদ্যোগে জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে এই বনের সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই বনে কাঠবিড়ালীদের গাছের ডালে ডালে ছুটতে এবং কুমাগেরা কাঠঠোকরা (black woodpecker) কে বড় আওয়াজ করে গাছ ঠুকরাতে দেখা গেছে। উল্লেখ্য, এই পাখি নাকি জাপানে হোক্কাইদোসহ উত্তরাঞ্চলে শুধু দেখতে পাওয়া যায়। আর হোক্কাইদো ছাড়া জাপানের অন্য অংশের বনে কাঠবিড়ালীদের সচরাচর দেখা মেলে না। এই বনে হরিণ ও খ্যাঁকশিয়ালও বাস করে। অন্য দিনে মারুয়ামা পাহাড়ের কাছাকাছি মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে তাদের দেখার সুযোগ হয়েছিল।

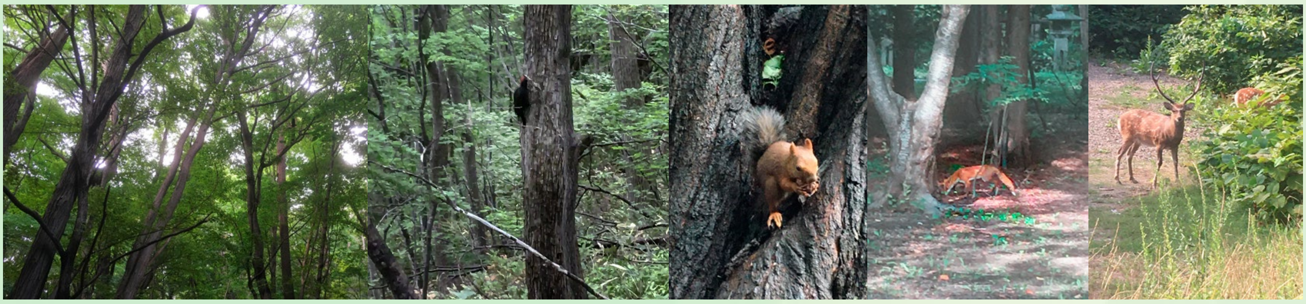

সাপ্পোরো হোক্কাইদোর প্রধান শহর। এখানে প্রায় ২০ লাখ লোকের বাস। জনসংখ্যার দিক দিয়ে জাপানের পঞ্চম বৃহত্তম শহর এটি। শহরটির উত্তর ও দক্ষিণ ভাগকে বিভক্ত করে দেড় কিলোমিটারের মত লম্বা ওওদোরি উদ্যান, যেখানে প্রতি বছর সাপ্পোরোর বিখ্যাত তুষার উৎসব ঘটা করে আয়োজন করা হয়ে থাকে (যদি না করোনার দাপট থাকে আরকি)। এর নাম ওওদোরি বা মহা সড়ক। নাম থেকে যেমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এটি মূলত রাস্তা হিসাবে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হলেও পরে পার্কে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কারণে একটি 'লম্বা' পার্ক তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যানের দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উঁচু উঁচু অত্যাধুনিক ভবন এবং শৌখিন রেস্তোরাঁ ও কাফেসমূহ।

এই ওওদোরি উদ্যান থেকে আমাদের নতুন বাড়ি যেতে লাগে ৪০ মিনিট। গাড়িতে নয়, হেঁটে। এর মানে, সাপ্পোরোর কেন্দ্র ভাগ থেকে মোটামুটি ৩ কিলোমিটারের পরিধির মধ্যে আমার বাড়ির অবস্থান। টোকিওতে শিন্‌জুকু রেলওয়ে স্টেশন থেকে ইয়োৎসুইয়া হেঁটে যেতে লাগে একই রকম সময়। বড় পার্থক্য হল, ইয়োৎসুইয়াতে পাহাড় না থাকলেও আমার সাপ্পোরোর বাড়ির কাছে আছে মারুয়ামা ও অন্যান্য পাহাড়।

টোকিওর পাশে কানাগাওয়া জেলার এক শহরে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করেছিলাম। জীবনের সেই পর্ব চুকিয়ে সাপ্পোরোতে চলে এসেছি এবছর মে মাসের শেষে। তার আগে হোক্কাইদোতে চলে যাওয়ার আমার সিদ্ধান্তের কথা জেনে আমার বন্ধু ও পরিচিত জনের অনেকেই অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চেয়েছেন।

প্রথম কারণ ছিল আমার ছেলের আমন্ত্রণ। ছেলের বদলির কাজ। ৩ বছর আগে ওর পোস্টিং হয়েছিল কোম্পানির সাপ্পোরো অফিসে। এসে জায়গাটা ওর ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছে। বলেছিল, “সাপ্পোরো অনেক সুন্দর শহর। এছাড়া টোকিওর তুলনায় সাপ্পোরোর গ্রীষ্ম অত্যন্ত আরামদায়ক। এয়ার কন্ডিশনারের প্রয়োজন হয় না। বাবা, তুমি মায়ের সঙ্গে সাপ্পোরোতে চলে আসার কথা ভেবে দেখতে পারো”। ছেলে কিন্তু ভুল বলে নি। বছর দুয়েক আগে ছেলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গরমকালে সাপ্পোরোতে বেড়াতে গিয়ে এখানকার আবহাওয়াগত গুণ লক্ষ্য করেছি। এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কিনা জানি না, গত কয়েক বছরে জুলাই-আগস্ট মাসে টোকিওতে গরমের মাত্রা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়ে আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। মনে আছে ছোটবেলায় স্কুলের গরমের ছুটি শুরু হওয়ার আগে ক্লাসে শিক্ষকরা এই বলে আমাদের পরামর্শ দিতেন যে, সকালে গরম অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তাই তোমরা দুপুর হওয়ার আগে বাড়িতে বসে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করো, আর বিকেলে বাইরে গিয়ে বেসবল খেলো, পোকা ধরো, সাঁতার কাটতে যাও এবং এইসব করে স্বাস্থ্যবান হবার চেষ্টা করো। এখন কিন্তু এই ধরনের উপদেশের কোনো মানে নেই। গরমকালে সকাল থেকে এত গরম যার মধ্যে বাইরে গেলে স্বাস্থ্যবান তো দূরের কথা, বরং স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে।

বাড়ি বদলির সিদ্ধান্তের পিছনে দ্বিতীয় কারণ ছিল বাংলার শিক্ষক হিসাবে চুক্তির মেয়াদের সমাপ্তি। বিগত কয়েক বছর ধরে টোওকিওর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়িয়েছি, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ৬৮ বছর বয়স হবার পর আর চুক্তি নবায়ন করা যায় না। তাই এবছর মার্চ মাসে সেই চাকরিতে ইস্তফা দিতে হল। সেই সঙ্গে রেডিওর কাজও ছেড়ে দেব বলে মনস্থির করেছি। ২০১২ সালে কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণের সময়সীমায় পৌঁছাবার পরও চুক্তির ভিত্তিতে বেতার অনুষ্ঠানের প্রযোজক হিসাবে কাজ করে এসেছি। রেডিওর কাজ করতে গিয়ে সবসময় টেনশনে থাকতে হয়। নির্ভুল ও সর্বশেষ তথ্য উপস্থাপন করতে পারছি কিনা, অনুষ্ঠানের ঐ অংশ অন্যভাবে বললে শ্রোতাদের বুঝতে আরও সুবিধা হোত কিনা, এইসব চিন্তা সব সময় আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এমন কি ঘুমের মধ্যেও কাজের চাপ থেকে মুক্ত হতে পারি নি। প্রায় এরকম স্বপ্ন দেখি যাতে আমি স্টুডিওর পাশে কন্ট্রোল রুমে বসে আছি। লাইভ অনুষ্ঠানের সময় হয়ে গেল। আমি স্টুডিওর ভিতরে থাকা একজন ঘোষিকাকে (যাঁর নাম এখানে উল্লেখ করা যায় না) ইশারা-ইঙ্গিতে স্ক্রিপ্ট পড়তে শুরু করতে বলি, কিন্তু তিনি খেয়াল করেন না। সময় মিছিমিছি চলে যায়। আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে...। ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে কতবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। শেষে ভাবলাম, আর নয়। যথেষ্ট সময় উৎসর্গ করেছি চাকরির জন্য। এই বয়সে এসে শান্ত মনে জীবন উপভোগ করতে চাইতে ক্ষতি কী? তাই রেডিওর চাকরিতেও ইস্তফা দিলাম।

অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে একটা ভাবনা উঁকি মারছিল। ভারত দর্শনের জীবনশাস্ত্রে যে চার অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়, সেটি আমার জীবনে প্রযোজ্য হবে না? ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যের পর্বের নিঃসন্দেহে অবসান ঘটে গেল। একদিন জাপানের এক বিশেষজ্ঞের লেখা বইতে পড়েছি, বাণপ্রস্থের পর্যায়ে লোক বনে বসবাস করলেও লোকসমাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এমন নয়। মাঝেমাঝে তার পরিবার-পরিজন তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাদের সঙ্গে পার্থিব বিষয় নিয়ে কথাও হয়। এই ব্যাখ্যা সঠিক কিনা জানি না, তবে আমার খুব ভাল লেগেছে। ২০১২ সালে রেডিও থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নেওয়ার পর যেভাবে জীবনযাত্রা করে এসেছি, সেটি হয়ত বাণপ্রস্থের জীবনের মত ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। তাই সবশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি; এতদিনকার জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন আরম্ভ করব।

সন্ন্যাস জীবন বলতে বোঝায় নাকি, মন যা চায়, সেই অনুযায়ী নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়ানো। সাপ্পোরোতে আসার পর তাই-ই করছি। রোজ মর্নিং ওয়াক করে মারুয়ামা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ঘুরে আসি। এছাড়া সাপ্পোরোর বাইরে কিছু জায়গায় বেড়াতেও গিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে আছে হোক্কাইদোর পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত জলাভূমি, যা জৈবপরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিশ্বব্যাপী চুক্তি রামসার কনভেনশনে নিবন্ধিত। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম নানা রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী যেগুলো টোকিওর জীবনে কখনো দেখা মেলে না। আরেক দিন ৪ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে বিখ্যাত ফুল বাগান দেখতে গিয়েছিলাম। সাপ্পোরো শহর থেকে বের হলে হঠাৎ রাস্তায় গাড়ির ভিড় কমে যায় আর অনেক দূর পর্যন্ত সোজা রাস্তাকে চলে যেতে দেখা যায়। ট্রাফিক সিগনালও কম হওয়াতে আরামে গাড়ি চালানো যায়।

এই লেখা যখন লিখছি সেই আগস্ট মাসের শেষে জাপানের অন্যান্য জায়গার মত হোক্কাইদোতেও করোনার ভয়ানক প্রকোপ চলছে। তাই মনের মত ঘুরতে গিয়ে কিছুটা সংকোচ বোধ করছি। এছাড়া পারিবারিক অর্থনীতির কথাও ভাবতে হয়। বর্তমান যুগের সন্ন্যাস জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। এছাড়া হোক্কাইদোর শীতকালটা যে কেমন হবে, তার এখনো কোনো ধারণা নেই। সত্যিকারের সন্ন্যাসীর পক্ষে হয়তো হিমালয়ে থাকতে কোনো অসুবিধা বা আপত্তি থাকবে না, তবু এই দুর্বল চিত্তের মেকি জাপানী সন্ন্যাসীর পক্ষে এখানকার হিমের দেশে থেকে যাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা, কে জানে। তবে যতটুকু পারি, সাপ্পোরোতে নতুন জীবন উপভোগ করব, সেটাই ইচ্ছা। ■

ক্ষুদ্‌দা এবং বাবুই চড়াইয়ের বাস্তব দর্শন

- অনুপম গুপ্ত

আশ্বিন মাস পড়তে না পড়তেই চারিদিকে যেন অ্যামবিয়েন্সের আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একটানা ক্লান্তিকর অবসাদগ্রস্থ বর্ষাকালের পরে শরতের আগমন মনের মধ্যে আনন্দের হিল্লোলিত শিহরণ এনে দেয়। এই উন্মাদনা সমগ্র হিন্দু বাঙ্গালী জাতিরই হয়। ক্ষুদ্‌দা বা রমলা বৌদিও এর ব্যতিক্রম নন। ক্ষুদ্‌দা তার সীমিত সঙ্গীত প্রতিভার ওপর নির্ভর করে গেয়ে উঠলেন,

বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা
গেঁথেছি শেফালী মালা
নবীন ধানের মঞ্জরি দিয়ে
সাজায়ে এনেছি ডালা।।

ক্ষুদ্‌দার মন উদাস, চলে গেছে সুদূর অতীতের দিনে। শৈশবের সপ্তমীতে নতুন জুতোর বদান্যতায় পদযুগলে ফোস্‌কার আবির্ভাবে অষ্টমী, নবমীতে ব্যান্ডএইডের সাহায্যে পুরাতন পরিত্যক্ত পাদুকার সলজ্জ সাহায্য গ্রহণ। নতুন জামার গন্ধের সঙ্গে ফুচকা, আলুকাবলী, হজমীগুলির গন্ধ একাকার। বকুলবাগানের সবকটি দোকানের খাদ্যবস্তু টেস্ট করার পরে বাড়ির খাবারের ইচ্ছা তিন দিনের জন্য মুলতবি থাকত। শিশু রমলার শৈশব বৃত্তান্ত জানা না থাকলেও শৈশবে দুর্গাপুজোর ব্যাকরণ একই হওয়ার কথা। নতুন জুতোর উদ্ধত আচরণ, নতুন পোশাকের সহৃদয়তা, ফুচকা ভক্ষণ এবং প্রতিমা দর্শন, বন্ধুদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলা, অকারণ হাসির অফুরান যোগান ইত্যাদি সব একই রকম।

কৈশোর পার হয়ে যৌবনের প্রারম্ভে কলেজে অধ্যয়নকালে সংযোজিত হল এক নতুন অধ্যায়। সুকুমার রায়ের 'ভালরে ভাল' কবিতাটার ছন্দটা নিয়ে একটু অন্যরকম করে যদি লেখা যেত তাহলে হয়তো এই রকম হত ---

টীনএজারদের সবই ভাল
ছাত্রছাত্রীরা দেখতে ভাল
ক্রিকেট ফুটবল খেলতে ভাল
প্রেমের বই পড়তে ভাল
দলবেঁধে গল্প করতে ভাল
লেকে দুজনে বসলে ভাল
রোমান্টিক সিনেমা দেখতে ভাল
উত্তম, গ্রেগরীপেক পার্টে ভাল
কিন্তু সবচেয়ে ভাল নিজেদের রোমান্স
প্রেমে ডুবতে যে পায় চান্স।।

বকুলবাগান থেকে আহিড়ীটোলায় গিয়ে রমলা নামক এক টীনএজারকে প্রেমের বঁড়শিতে গাঁথা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক পরিশ্রম করে, অভিভাবকদের গুলগাপ্পি মেরে গঙ্গা ও লেককে সাক্ষী রেখে (তখন প্রেমের পীঠস্থান নন্দন তৈরি হয়নি) রমলা চাকলাদারকে গৃহিণী করতে হয়েছে।

দু হাজার ঊনিশ সালের মে মাসে ক্ষুদ্‌দা ও রমলা বৌদিকে জাপানে যেতে হয়েছিল পরিবারের সদস্য সংখ্যা পরিবর্ধনে নতুন অতিথির আগমনকে শুভেচ্ছা জানাতে। বৌদি বায়না করলেন জাপানের দুর্গাপুজোয় যাওয়ার জন্য একটা দামী শাড়ি চাই। ক্ষুদ্‌দা ভাবলেন রমলার তো অনেক ভাল দামী শাড়ি আছে, আবার একটা কেনার কি দরকার! যাইহোক পুরনো শাড়ি দিয়েই পুজোটা কেটেছে।

দু হাজার একুশ সালে নাকি পুজোর আগে জাপানে যাওয়ার কথা হচ্ছে, যদি বিমান পরিষেবা সঠিক ভাবে চালু হয়। বৌদির বলিষ্ঠ বক্তব্য পুরনো শাড়ি পরে জাপানের পুজোর অনুষ্ঠানস্থলে নাকি যাওয়ার নিয়ম নেই। দাদা বৌদিকে বোঝালেন জাপানের দুর্গাপুজোয় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখার কোন ব্যাপার নেই। অতএব নতুন শাড়ি কেনার কোন দরকার আছে কি? বৌদি বললেন, "তোমাদের শ্যামলদা, রঞ্জনদারা কি বারমুডা পরে পুজোর হল'এ বসে থাকেন? রীতাদি বা রুমাদিরা নিশ্চয়ই বাড়ির ম্যাক্সি পরে অনুষ্ঠান স্থলে আসেন না"।

রমলা বৌদি ক্ষুদ্‌দাকে বাবুই পাখী আর চড়াই পাখীর কবিতার ভাষায় কথোপকথন শোনালেন ---

বাবুই পাখীরে ডাকি কহিছে চড়াই
এই পুজোতে রমলার গাদোয়াল চাই।

ক্ষুদ্‌দা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আরে পরের লাইন যখন বাবুই বলছিল তখন তুমি হয়তো রান্নাঘরে ছিলে, তাই শুনতে পাওনি---

শুনিয়া বাবুই কহে সন্দেহ কি তাতে
করোনার করুণায় ম্যাক্সি দেয় গায়েতে"।।

বৌদি বললেন, "তোমাকে দেখেই হয়তো আশা ভোঁসলে গেয়েছেন ---

এনে দে রেশমী চুড়ি
নইলে যাব বাপের বাড়ি
দিবি বলে কাল কাটালি
জানি তোর জারিজুরি।।

ক্ষুদ্‌দা সব নামীদামী শাড়িদের বুকফাটা কান্নার সম্মিলিত আওয়াজের কথা বৌদিকে শোনালেন। করোনার এই প্যান্ডেমিকে শাড়িদের কি করুণ অবস্থা! বিক্রি নেই, খদ্দের নেই, কোন সাংস্কৃতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান নেই যেখানে আলমারি থেকে শাড়ি বের করে পরিধান করে দু বছর ধরে শাড়িতে সেঁটে থাকা ন্যাপথলিনের উগ্র গন্ধ তাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু কোন উপায় নেই। ওদের কান্নার ভাষা বুঝলে হয়তো এইরকম হত ---

বেনারসী শাড়ি বলে জামদানি বোনটি
কত কাল ঠাঁই লব আলমারির কোনটি
গাদোয়াল চান্দেরীর আঁখি করে ছল ছল
ভেবেছিনু এবছর পুজোতে যে পাব বল।
রবি কবি নজরুল দুবছরেও হল না
লাল পাড় সাদা শাড়ি অঙ্গেতে ওঠে না।
করোনার ঢেউ বলে আরও নাকি আসছে
নামী দামী শাড়ি সব আলমারিতে জমছে।
খিল খিল হেসে বলে ম্যাক্সি ও কাফতান
পুজোতে দোকানী সাজায়, আমরাই মাস্তান।।

দামী শাড়িদের কান্নার কবিতা শুনে রমলা বৌদিরও মজা লেগেছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। ক্ষুদ্‌দাকেও তো অফিসে যেতে হচ্ছে না। বাড়িতে বসেই ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে হচ্ছে। কোথাও যাতায়াত নেই। অফিসের পার্টি, সামাজিক অনুষ্ঠান সবই বন্ধ। নতুন টি সার্ট আর জিনসের প্যান্ট কেনা মানেই তো সঙ্গে বেঙ্গল কেমিক্যালের এক বাক্স ন্যাপথালিন কেনা। আর নতুন প্যান্ট সার্ট কেনার প্রয়োজনটাই বা কি?

বৌদি ক্ষুদ্‌দাকে বললেন বাবুই পাখী আর চড়াই পাখী নাকি কবিতায় আবার কিছু বলছে ---

ওয়ার্ক ফ্রম হোমে লাগে শুধুই পাজামা
ঘর যদি ঠাণ্ডা থাকে, লাগে গেঞ্জি ও মোটা জামা
দুটি পাখী বলে শেষে একথাটাই সত্যি
শাড়ি শার্ট কিনলেও ট্রাঙ্ক কিন্তু ভরতি।
বাবুই পাখী বলে,
কেন কর কলহ
চড়াই বলে শাড়ি জামা
সবই রাহু বা কেতু গ্রহ।।

ক্ষুদদা বললেন রূপকথার গল্পের ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীর মতন পাখী দুটো বর্তমান বাস্তব কথাই বলছে। এই প্যান্ডেমিকে শাড়ি জিনসের পেছনে ছুটে কোনো লাভ নেই। শুনছি এরপরে একের পর এক ঢেউ আসবে। এগুলো নাকি পুরীর সমুদ্রের মতন ঢেউয়ের অবিরাম আগমন।

চড়াই কহে শোনো আসিতেছে ডেল্টা
আসিবে, কহে বাবুই, আলফা, গামা এবং বিটা।।

বৌদি দাদাকে বললেন, "দেখ, পাখী দুটোর কথাই ঠিক। গাদোয়াল, করিয়াল করে কোন লাভ নেই। তার থেকে জাপানের বিমান পরিষেবা আবার চালু হলে জাপানে যাওয়াই ভাল। পুজোর দিন দুপুরে ব্যোমকেশদার তৈরী করা লাঞ্চ পাওয়া যাবে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানস্থল পরিস্কার করার পর ভান করে একটু থেকে যেতে পারলে লোভনীয় ডিনার প্যাকেট পাওয়া যাবে। শ্যামলদা বা রঞ্জনদা হয়তো বাধা দেবে না। কিন্তু দু হাজার একুশ সালে জাপানে যাওয়ার বিমানের টিকিট পাওয়াই এক সমস্যা। ফ্লাইট অপ্রতুল হলেও শাড়ি জিনস্ কিন্তু প্রতুল। বাবুই এবং চড়াই পাখীর বাস্তব চিন্তার কথা মাথায় রেখে দুই পাখীকে সাধুবাদ জানিয়ে শাড়ি জিনস কেনা থেকে বিরত থাকার কথা চিন্তা করা হল।

তবে দু হাজার একুশ সালের প্যান্ডেমিক, গাদোয়াল, চান্দেরী, জিনস্, টি সার্ট, ন্যাপথলিন, আলমারি, ট্রাঙ্ক নিয়ে বাবুই এবং চড়াই পাখীর কথোপকথন খুবই উপভোগ করার মতন।

একটা জিনিস বোঝা গেল। লোক দেখানো কলহের মধ্যে ফুটে উঠছে দাদা বৌদির গভীর রোমান্সের নিবিড় আকর্ষণ।

বাবুই পাখীরে ডাকি কহিছে চড়াই
ক্ষুদিরাম রমলার প্রেমে শেষ নাই
শুনিয়া বাবুই কহে চান্দেরী কেন কিনিবে
টাকা থাক বাংকে, কেনই বা বিলাবে?

বাবুই এবং চড়াই অনেক চিন্তা করে, আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে এল ---

চড়াই কহে শোন বাবুই মশাই
পুজোয় নতুন শাড়ি রমলার চাই
শুনিয়া বাবুই কহে একটাই তো বউ
ক্ষুদিরাম কিনে দিক, যত আসে ঢেউ।।

ক্ষুদ্দা অনেক তর্ক বিতর্কের পরে রমলা বৌদির জন্য একটা দামী শাড়ি কিনে আনলেন, জাপানে যাওয়া হোক আর নাই হোক। এইভাবেই হয়তো জগতের সব বৌদিরা জিতে যান। শ্যামলদা, রঞ্জনদা হয়তো শেষ পর্যন্ত রীতাদি রুমাদির কাছে হেরে যান। এই গৌরবময় পরাজয়ের আনন্দই আলাদা, যদিও অনেকেই এই আনন্দ উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত। বেচারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে চান্দেরী, গাদোয়াল কিনতে হয় না এবং রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে চান্দেরী গাদোয়াল কেউ কিনেও দেন না। অবশ্য রাজ্যের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও চান্দেরী, গাদোয়াল কিনতে হয়নি।

রমলা বৌদি তার বজ্রমুষ্টি আকাশে তুলে বললেন,

লং লিভ বাবুই চড়াই!! ■

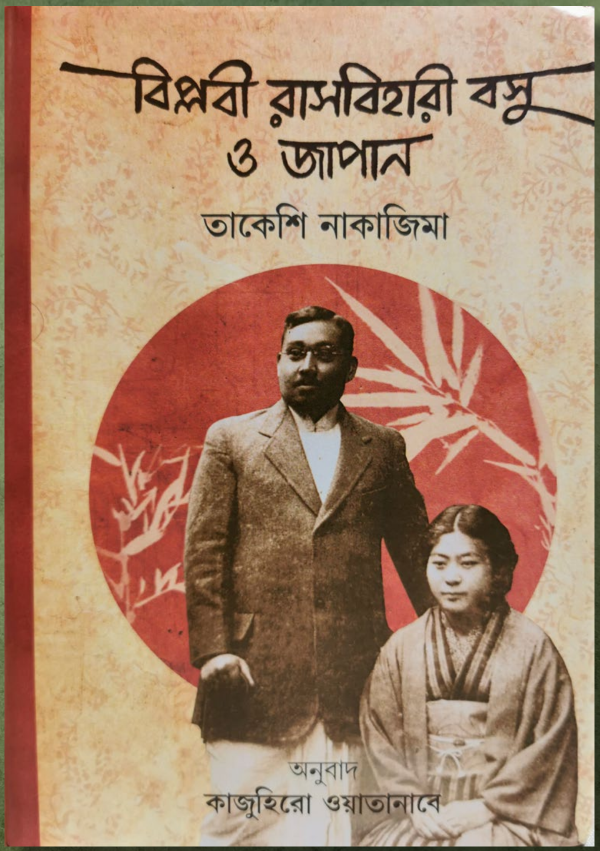

উমা

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

ছোটবেলায় গরমের ছুটি বা পূজোর ছুটির পর স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের মধ্যে প্রথম গল্প হোত ছুটিতে কে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল। অনেকেই বলতো কয়েকদিনের জন্য মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার খুব অদ্ভুত লাগতো আমার মামাবাড়ি কেন রাস্তার উল্টোদিকে? মানে এপাড়ে চক্রবর্তীদের বাড়ি আর ওপাড়ে চ্যাটার্জীদের বাড়ি। সব বন্ধুদের মামাবাড়ি এত দূরেদূরে আর আমার মামাবাড়ি কেন রাস্তার উল্টোদিকে? বাড়ির গেট থেকে বেড়িয়ে ডান বাঁ দেখে এক ছুটে রাস্তা পেরোলেই আমার মামাবাড়ি। আর তাই আমাদের মামাবাড়ি বেড়াতে যাওয়া মানে সকালে গিয়ে রাতে ফেরা। মাঝেমধ্যে ২/১ দিন থাকা হয়নি এমনও নয়, তবে সেটা খুবই কম।

ছোট থেকেই মা বাবুর সমসাময়িক মাসি, কাকু, কাকিমা, জেঠু, জেঠিমার কাছে শুনেছি আমার মায়ের কথা। 'উমা'এই একটা নামেই সবাই মাকে চেনে। কিন্তু মা'র নাম তো অন্য। তাহলে? উমা কেন? বাড়ির ছোট মেয়ে আমার মা। দাদু আদর করে নাচ শিখিয়েছিলেন। আমরা এখন যেমন প্রোগ্রাম বলি, তখন বলা হোত ফাংশন কিংবা জলসা। এলাকার এক ফাংশনে আমার মা কুমারসম্ভবে উমার রোলে ছিলেন। আমি বড় হয়ে পর্যন্ত শুনেছি সেই নাচের কথা। তখনও সবার মুখে মুখে ফিরতো সেই ফাংশনের কথা, সেদিন 'উমা'র ভূমিকায় মায়ের কথা।

চ্যাটার্জী পরিবারের ছোট মেয়ে আমার মা চক্রবর্তী পরিবারের বড় বৌমা হয়ে এলেন এ বাড়িতে। কিছুদিনের মধ্যেই আমার বাবু অল ইন্ডিয়া রেডিওর কাজ নিয়ে দিল্লীতে চলে গেলেন। হোস্টেলে পড়াশুনো করেছেন বাবু। তাই নিজেরটা করে নিতে অসুবিধে হোতনা। কয়েকমাস পর মা গিয়েছিলেন বাবুর কাছে দিদি আর আমাকে সঙ্গে করে। রান্নাবান্না কিছুই জানতেননা মা। বাবু নাকি আস্তে আস্তে সব শিখিয়েছিলেন। বড় হয়ে বুঝেছি নতুন সংসারে এসে মায়ের নিজের ইচ্ছেগুলোকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল। তখনও ঘরে ঘরে Zee বাংলা ছিলনা। টিভির পর্দায় "দিদি নম্বর 1 " ছিলনা।

তখনও "জাগো শক্তি, জাগো স্বপ্ন, জাগো স্পর্ধা, জাগো ইচ্ছে, জাগো জাগো উমা....." ধরনের গান লেখা হোতনা। তাই নিজের ইচ্ছে, নিজের প্যাশন, নিজের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করার গল্প ছিল খুব কম। তাতে অবশ্য মা'কে কখনও অখুশি দেখিনি। বরং আমাদের দুইবোনের পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে দিদির গান আর আমার নাচ শেখা এবং তার রেওয়াজের প্রতিনিয়ত আপডেট ইত্যাদির উপর কড়া নজর ছিল।

বাবুকে দেখেছি নাটক করতে, আবৃত্তি করতে। দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্কের বঙ্গীয় পরিষদের অনুষ্ঠিত নাটকের পরিচালনা করতেন। কোলকাতায় ফিরে আসার পরেও অনেকেই আসতো বাড়িতে আবৃত্তি শিখতে। বিভিন্ন ক্লাবের নাটকের পরিচালনা করতেন। নাট্যালোক নামের এক নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাবু। বাবুর অভিনীত অনেকগুলো নাটকের মধ্যে খুব মনে পড়ে "রোশেনারা" নাটকে মিস্টার আলীর চরিত্রটা। মনে পড়ে "স্বর্গে মিছিল" নাটকে ভৃঙ্গির চরিত্রের অভিনয়। বাবু নিজের চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে এতকিছু চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কারণ বাড়িতে একজন "উমা" (আমার মা) ছিলেন। সবকিছুর দায়দায়িত্ব ভার তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে হাসিমুখে।

বাবু খুব ভাল বাঁশি বাজাতেন। আড় বাঁশি। আমাদের বাড়িতে গ্যাসে রান্না হোত ঠিকই, কিন্তু অসময়ে দরকারে লাগতে পারে বলে কয়লার উনুনও ছিল একটা। চোখে ভাসে একটা দিনের কথা। সেদিন বাড়িতে গ্যাস নেই। মানে দুপুরের রান্না অবধি গ্যাস ছিল কিন্তু রাতে গ্যাসের নব্ ঘোরাতে বোঝা গেল আর নেই,ফুরিয়ে গেছে। অগত্যা সেই উনুন। লোডশেডিংয়ে মা রান্না করছেন, বাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন। আগুনের তাপে মায়ের মুখচোখ সব লাল। আজ এতবছর পরেও যখন রাহুল দেববর্মনের "ও...আমি যখন রানতে বসি,ও...তুমি তখন বাজাও বাঁশি,ধোঁয়ার ছলে কানতে বসি, প্রাণতো মানে না রে" গানটা শুনি বুকটা মুচড়ে ওঠে, মনে পড়ে সেই সন্ধ্যেটার কথা। তখনতো ফলাও করে স্বামী স্ত্রীর কেমিস্ট্রির কথা বলা হোতনা, কেউ বললেও সেটা বেমানান শোনাতো।

উমার মেয়েরা যে যার মত বড় হোল, মানে বয়সে আরকি। তারপর যা হয়, যে যার মত চলেও গেল পরের বাড়ি। পরের বাড়ি বললে কেমন পর পর ঠেকে। তাতো বটেই তা না হলে ঘটা করে বাপের বাড়ি কিংবা বাবার বাড়ি আর শ্বশুড়বাড়ি বলা হবে কেন? তাই বিয়ের পরের বাড়িটা পরের বাড়িই বটে। যদিও আস্তে আস্তে পরের বাড়িটা কেমন করে যেন নিজের বাড়ি হয়ে যায়। উমার মেয়েদের আর রাস্তার উল্টোফুটে পাত্র জোটেনি।

আশেপাশে বাঁশ বাধা হয়ে গেছে। কুমোরটুলীতেও অসম্ভব ব্যাস্ততা, খড়ের কাঠামোতে মাটি পড়েছে, ঠাকুর তৈরী হচ্ছে। বিশ্বকর্মা পূজোও শেষ হোল। শরতের আকাশে নীল মেঘের খেলা। ভোরের দিকে হাল্কা ঠান্ডা। শিউলি ফুল ফুটছে এদিক ওদিক। যে উমা শুধু সংসারেই নিবেদিত প্রাণ ছিল হঠাৎ করেই সেই ভরা সংসার শূণ্য করে চলে গেল আজকের দিনে। ৯ই অক্টোবর। সেদিন ছিল মহালয়া। আত্মীয়স্বজন বললেন মহালয়ার দিনে যাত্রা, শুভ দিন আজ। মায়ের চলে যাওয়ার দিন কি আর শুভ হয়?.... উত্তর খুঁজেছি। অনেক হাতড়েও তার উত্তর পাইনি। জীবনে কিছু কিছু উত্তর বড় বেহিসাবী হয়। সারাজীবনেও মেলেনা। কিংবা বলা ভাল মিলতে চায়না।

শুধু টের পেয়েছিলাম দুদিন আগের শরতের ঝলমলে আকাশটা কেমন মেঘলা হয়েছিল.......তুমি কেমন আছো মা? ■

হেমন্তের আলো

- শঙ্কর বসু

মানুষটার দিকে একবার চোখ পড়ায় বিদ্যুতের চমক খেলে যায় প্রলয়ের শরীরে। হুইলচেয়ারে বসা রুগ্ন, ক্লান্ত চেহারার আবছায়ায় উজ্জ্বল দুটো চোখ, যে চোখে হারিয়ে যাওয়া শিশুর শঙ্কিত উত্তেজনা। মুহূর্তে ভাবনার জগতে হারিয়েই গেছিল প্রলয়, এক ঝটকায় নিজেকে প্রস্তুত করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল মানুষটার দিকে। "নমস্কার দেবেনবাবু, আপনি আমাকে চিনবেন না..."- প্রলয়ের কথা শেষ হওয়ার মুহূর্তে মানুষটার মুখে একমুঠো আলগা আলো ছড়িয়ে পড়ল, মৃদু হাসির রেশ। "যাক, তাহলে চিনতে ভুল হয়নি মানুষটাকে- বাবাঃ, প্রায় তিন দশকের কথা" প্রলয় মনে মনে বলে উঠলো।

দেবেন্দ্র মুখার্জী, সুরের জগতের বিস্ময়সৃষ্টি, আকাশবাণীর ঈশ্বর। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তৈরী কণ্ঠ, তবু আধুনিক বাংলা গানের অবিসংবাদিত সম্রাট। গানের জলসায় কেন্দ্রীয় আকর্ষণ, কলেজ সোশ্যালের সেন্সেশন। চল্লিশবছর আগের সময়টা এমনই ছিল, প্রলয়ের স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই স্কুলে পড়ার সময়- যখন দুর্গাপুজো সত্যিই একটা রঙ্গিন স্বপ্ন যার জন্য সারা বছর হা-পিত্যেশ করে অপেক্ষা। মনে পড়ে সপ্তমীর সন্ধ্যায় প্যান্ডেলে ভেসে আসা দরাজ গলার পুজোর নতুন গান, সুরের মায়াজাল। মানুষটার অমোঘ আকর্ষণ কতবার তাকে পৌঁছে দিয়েছে গানের জলসায়, কলেজ সোশ্যালে, কিন্তু বলিষ্ঠতর ভক্তকুলের সীমানা অতিক্রম করা দুবলা পাতলা প্রলয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই দূরত্ব আর কোনোদিন ঘোচেনি। উপরন্তু পড়াশোনার পাঠ শেষ করে শহর কলকাতার সাথে দূরত্ব আরো বাড়িয়েছে প্রলয়- এক যুগের ওপর সে বাসিন্দা পশ্চিমের মনোরম এই শৈলশহরের। এবং এই জীবন আপাতভাবে বেশ সুখের।

"দেবেনবাবুর ব্যাপারটা বেশ দুঃখের"- রাণাদা কথাটা বলেছিল জাস্ট ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হিসেবে। অফিসের একটা পার্টীতে, পুরনো বাংলা গানের আলোচনার মাঝখানে। রাণা, মানে রণদিত্য, সঙ্গীতের প্রকৃত সমঝদার- এক সময়ে শিল্পীমহলে যথেষ্ট আনাগোনা ছিল। প্রলয়ের জিজ্ঞাসু চোখে আর সংশয় না বাড়িয়ে আউড়ে গেছিল... "অ্যাসমার কারণে গানের চর্চা আর ধরে রাখতে পারেননি মানুষটা, শুনেছি পারিবারিক কি একটা দুর্ঘটনার শিকারও হয়েছিলেন। মোদ্দা কথা পাবলিকের চোখে দেবেন মুখুজ্যে এখন নন-এন্টিটি"। ব্যাপারটা হাল্কাভাবে আলোচিত হলেও প্রলয় বেশ দুঃখ পেয়েছিল, কৈশোরের দেবতার এমন করুণ পরিণতি স্পষ্টতই মনভার করেছিল। সেও হয়ে গেল বছর খানেক।

এয়ারপোর্টের অ্যারাইভাল লাউঞ্জে হুইলচেয়ারে বসা অশীতিপর সঙ্গীতসাধককে আবিস্কার করে প্রলয় বেশ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছিল। দেবেনবাবুর হুইলচেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক, আত্মীয়ই হবে নিশ্চয়। এগিয়ে আসা প্রলয়ের দিকে সোজাসুজি চোখ মেলে তাকালো সেই যুবক। খানিকটা বিস্ময় সেই চোখে, "আপনি দাদুকে চেনেন?" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল প্রলয়ের। "অনেকদিনের সম্পর্ক আমাদের" – নীচু হয়ে বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম শেষ করে বলল প্রলয়- "একটু ওঁর সঙ্গে এক্সিট গেট পর্যন্ত যেতে পারি? অবশ্য যদি অনুমতি দেন..."। খানিকটা অপ্রতিভ হল যুবক, "আরে না না, কিছু মনে করবেন না, আসলে দাদু কাউকে চিনতে পারেন না আর ওঁকেও অনেকদিন কেউ চেনেন না। তাই বেশ অবাক হয়েছিলাম। বেশ তো, আপনি আসুন না আমাদের সঙ্গে"।

কর্পোরেট বস প্রলয় রায়চৌধুরী পরম মমতায় বৃদ্ধের হাতে হাত রেখে স্বগতোক্তি করল "অবশেষে ছুঁলাম তোমায়..."।

হেমন্তের আলোয় গানভঙ্গের ছবি আঁকা শেষ হল। ■

স্মৃতির পাতা থেকে

- শমিত রায়

সালটা ১৯৮৬ জুন মাস, তারিখটা ঠিক মনে নেই ! কিছুদিন হলো ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড-এ চাকরিতে ঢুকেছি। গ্রেড-৫ অফিসার, ডেসিগন্যাশন একাউন্টেন্ট, পোস্টিং কলকাতা ব্রাঞ্চে, মানে মোমিনপুর। আমাদের হেড অফিস তারাতলাতে। কিন্তু আমরা সেখানকার ডাক পেলে একটু ভয়ে থাকতাম, কি না জানি গন্ডগোল আবার বাধলো।

একটা জালিয়াতির ঘটনা ঘটল কলকাতা ব্রাঞ্চে এবং ঘটনাটি গোচরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হেড অফিস থেকে ডাক। আসলে ডাক এসেছিলো আমার বস রিজিওনাল ফিনান্স ম্যানেজারের, কিন্তু তিনি কায়দা করে ট্যুরের অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ে আমাকে বাঘের মুখে পাঠালেন। দেখা করতে হবে চিফ এক্সেকিউটিভ-ফিনান্স, শেখর রায় সাহেবের সঙ্গে। লাঞ্চ এর পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিলাম এবং ঠাকুরের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মোমিনপুর থেকে তারাতলার উদ্দেশ্যে। বেশ ভয় ভয় করছিলো ! একে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় সেই জয়েনিং এর সময়, তার উপর শুনেছি খুব কড়া ধাঁচের লোক। মনে মনে বেশ রাগ হচ্ছিলো আমার বসের উপর আমাকে এই একা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এই ভাবতে ভাবতে কখন যে পনেরো মিনিট কেটে গেছে আর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো তারাতলার হেড অফিসে। শেখর রায় সাহেবের সেক্রেটারি মিসেস লাংরানার সাথে দেখা করলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে জানালাম যে রায় সাহেব আমাকে ডেকেছেন। দারুন মহিলা এই মিসেস লাংরানা। অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান, বয়স বছর পঞ্চাশের কিছু বেশী হবে, কিন্তু খুব স্নেহপ্রবন মনে হলো। ওনার সিট-এর উল্টো দিকে বসতে দিয়ে বললেন "বস ইজ ইন এ মিটিং, ইউ উইল বি কলড"। ইন্টারকম'এ চা-এর অর্ডার দিলেন। কিছুক্ষনের মধ্যে চা এলো। আমরা চা খেলাম এবং সৌজন্য বিনিময় করলাম। ওনার ছেলেমেয়েদের গল্প করলেন। আমাকে হয়তো দেখে আন্দাজ করছিলেন যে আমি খুব টেনশনে আছি। বললেন ভয় বা টেনশনের কিছু নেই। সাহেব কাজে কড়া, কিন্তু খুব ভালো মানুষ। কিছুটা স্বস্তি পেলাম, কিন্তু ভয় পুরোপুরি কি আর দূর হয়। আমাদের কথার মাঝে মিসেস লাংরানা উঠে গিয়ে বসের দরজা ফাঁক করে ফিরে এসে বললেন যে মনে হয় বেশ কিছু সময় এই মিটিং চলবে। তুমি বরং নিচের তলায় ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট এর অফিসে গিয়ে বসতে পারো। ওখানে তোমাদের লাইনের ছেলে পাবে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগবে। এই বলে উনি ইন্টার কমে কাকে যেন ফোন করে বললেন আমার কথা। আমায় বললেন চলে যাও নিচে, আমি বলে দিয়েছি।

আমি নিচের তলায় ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে এসে পৌঁছে গেলাম চিফ এক্সেকিউটিভ-এর অফিসে। এক ভদ্রলোক কি একটা কাজ করছিলেন, পরিচয় দিতেই আমাকে তার উল্টো দিকের সিটে বসতে অনুরোধ করলেন। পরিচয় দিয়ে বললেন যে উনি এক্সেকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট টু চিফ এক্সেকিউটিভ-ফিনান্স, নাম সুশীল হোড়। জানালেন যে উনি ইউ.কে থেকে এ.সি.এম.এ করে বিলেতে চাকরি করতেন। পারিবারিক প্রয়োজনে বিলেত ছেড়ে ইন্ডিয়াতে এসেছেন। আমাকে বললেন তুমি আমাকে হোড়দা বলে ডাকতে পারো। বললেন কাজের খুব চাপ তাই উনি হয়তো সবসময় আমার সাথে কথা চালিয়ে যেতে পারবেন না। আমি বললাম তাতো ঠিক। এই বলে মনে একরাশ ভয় নিয়ে যে কখন রায় সাহেবের ডাক আসে, আমি হোড়দার কাজ দেখতে থাকলাম। দেখলাম যে ভদ্রলোক প্রায় সব কাগজের ফটো কপি করছেন। হয়তো কিছুটা লজ্জায় জানালেন যে রায় সাহেব বলেছেন যে সব কাগজের কপি হেড অফিসে থাকা চাই, তা সে দরকারি অদরকারি যে নথি হোক। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম যে প্রতিবার ফটোকপি করার পর হোড়দা কপিটা অরিজিনাল-এর সাথে মিলিয়ে নিচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখার পর আর না পেরে হোড়দাকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম যে আপনি বার বার এই কপি অরিজিনাল-এর সাথে মেলাচ্ছেন কেন ? এটা সময়ের অপচয় নয় কি? হোড়দা বেশ গম্ভীর ভাবে বললো, ভাই হে, তোমরা তো ব্রাঞ্চে কাজ করো, হেড অফিসে কাজ করার জ্বালা জানোনা। বুঝলে ভাই, একবার রায় সাহেবকে ফটোকপি করে দিয়েছি। আর তখনই মেশিনে কালির কিছু সমস্যা ছিল। রায় সাহেব তো সেই কপি নিয়ে মিটিং-এ ঢুকেছেন, তারপর কিছু ফিগার স্পষ্ট ছিলোনা বলে রায় সাহেবের মিটিং-এ খুব অসুবিধা হয়েছিল। মিটিং থেকে বেরিয়েই আমার খোঁজ। কার মুখ দেখে সেদিন যে উঠেছিলাম ভাই, রায় সাহেবের সে ঝাড় আমার আজও মনে আছে। আমাকে তো এও বলেছিলেন যে আপনাকে কি কাজ দেব বলুনতো ? আপনি তো একটা ফটোকপিও ঠিকমতো করতে পারেন না। সেই থেকে বুঝলে ভাই, আমি সব সময় ফটোকপি অরিজিনাল-এর সাথে মিলিয়ে দেখে নেই যে সব ঠিক আছে কি না। এতক্ষনে হোড়দার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। দেখলাম কাজ যাই করুক না কেন বেশ দিলখোলা লোক। মনে মনে ভাবলাম যে যতই হোক অনেকদিন ইউ.কে তে ছিলেন বলে হয়তো এতো উদার। হোড়দা আমাকে এবার আস্বস্ত করে জানালো যে রায় সাহেব বাইরে খুব কড়া হলেও, খুব ভালো মনের একজন মানুষ, কারো ক্ষতি করেন না। তবে উনি মিথ্যা কথা বা বানিয়ে গল্প বলা মোটে সহ্য করেন না। আমাকে হোড়দা উপদেশ দিলেন যে আমি যেন ঘটনা বিকৃত না করে আমার যা জানা তাই যেন জানাই এবং সেক্ষেত্রে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কিছুক্ষনের মধ্যে আমার ডাক পড়লো। ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম রায় সাহেবের ঘরে ! দেখলাম স্যুট - টাই পরা এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আমাকে বসতে বললেন এবং ডাকতে দেরি হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর সম্ভবত পরিবেশটা হালকা করার জন্য আমার নানা রকম খবরাখবর নিলেন, বাড়ির এবং কাজের ব্যাপারে। এরপর জালিয়াতির ঘটনাটি আমি যেমন জানি জানালাম। রায় সাহেব আমাকে পরবর্তী পদক্ষেপে কি করা উচিত বুঝিয়ে দিলেন। যে ভয় নিয়ে গেছিলাম কেটে গেলো। আমাদের মিটিং আধ ঘন্টা মত চলার পর ছাড়া পেলাম। মিসেস লাংরানাকেও বিদায় জানাবার পর, ভাবলাম যে হেড অফিস ছাড়ার আগে একবার হোড়দার সাথে দেখা করে যাই। ঘরে ঢুকে দেখি যে হোড়দা ফটোকপি করে যাচ্ছেন আর সেই কপি অরিজিনাল এর সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজন ছিলোনা, তাও কি জানি কেন হোড়দাকে মিটিংয়ের ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত আকারে জানালাম। মনে হল আমার রায় সাহেবের সাথে মিটিং ভালোয় ভালোয় কেটেছে শুনে হোড়দা খুব আস্বস্ত হয়েছেন। এরপর সেদিনের মত হেড অফিস ছেড়ে আবার আমার মোমিনপুরের ব্রাঞ্চ অফিসে ফিরে এলাম।

এরপর হোড়দার সাথে বহুবার নানা কাজে দেখা হয়েছে, কিন্তু সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। ■

শিক্ষা

- আশা দাস

শিক্ষা বলতে বিশেষ কোন প্রক্রিয়া বোঝায় না। বোঝায় শুধু একটি ক্রম পরিণতি বোধ ও অনুভূতি, যা হলো শিক্ষার পরম সামগ্রী। যা কিছুই জীবনে আসুক না কেন তাকে নিবিড় করে অনুভব করার মধ্যে যে সাধনা আছে সেটাই হলো শিক্ষার একটি বিশেষ পরিণতি। সব কিছুকে কুড়িয়ে নিতে হবে জীবনের পথে চলতে চলতে।

নানান রঙের ফুলে সাজি ভরতে হবে। কোন ফুল সূর্যের কিরণে স্নাত আবার কেও বা অশ্রু শিশিরে সিক্ত, যা দিয়েই সাজি ভোরে উঠুক না কেন সবইতো তাঁরই পূজায় লাগে। তাই শিক্ষা মানুষ কে জীবন নদীর তীরে দর্শকের ভূমিকায় দীক্ষিত করতে পারে।

সেখানে নেই আসক্তি, নেই কোনো চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকাশ, আছে জীবনের পরিণতির পথে অভিযান।

শিক্ষার লক্ষ্য কেবল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিধান নয়, তার অন্যতম লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক জীবনের পথে উত্তরণ। জীবনের রিক্ততাকে তুচ্ছ করে পূর্ণতার প্রতীক্ষায় প্রহর গোনা যদি মানুষের লক্ষ্য হয়, তাহলে সেই প্রতীক্ষা কোনো দিনই ব্যর্থ হয় না, প্রতীক্ষার মধ্যেই আছে সাধনার ইঙ্গিত।

জীবনের নৈরাশ্য, বিশাদ ও দুঃখের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পেতে হলে কামনা বাসনার বেড়াজাল থেকে মুক্তির প্রয়োজন। অতএব শিক্ষা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথ প্রদর্শক। ■

ॐसह नाववतु।
सह नौ भुनक्तु।
सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ शान्ति:शान्ति:शान्ति:।।

বড়ো হওয়া

- আগমনী পাঠক

ঘরের কোনে ছোট্ট চেয়ারটার হাতলে নীহারিকা বসে একমনে বাইরের টগরফুলের গাছের দিকে চেয়ে আছে। ওগুলো দেখতে ওর ভীষণ ভালো লাগে। ওদের দোতলার ঘরের দুই জানালা থেকেই নিচের ভালো দাদুদের উঠোনের গাছটা দেখা যায়। ঘুম ভাঙলেই খোলা জানালা দিয়ে ওই গাছ ও সাথে ওর ছোট্ট ছোট্ট সাদা ফুলগুলো দেখতে পায়। মা খুব ভোরে ওঠে, নীহা উঠতে পারে না অত ভোরে তবে সকালের প্রথম রোদ্দুরটা ওর মুখে লাগলেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। তারপর নীহারিকা মুখ হাত ধুয়ে চৌকো টিনের বাক্স থেকে নিজের বই খাতা বের করে পড়তে বসে। ও এখন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেনীর ছাত্রী। আজকাল পড়াশোনায় মন দিয়েছে দেখে ওর মা এসে বলল, "কিরে, স্যার বকেছেন বুঝি?"

"না, বকেনি। আমি তো সব পারি, কিন্তু আমার নতুন বন্ধুদের মত এত্ত এত্ত ছড়া পারি না। আর মা ওরা সব অন্য অন্য দেখতে অক্ষরগুলোও বলে দেয়। আমি পারি না"

"বলছি, আগে দুধ টুকু খেয়ে নে" এই বলে নীহার মা, নীরা সকালের ব্যস্ত সময়েও মেয়ের মাথায় গায়ে একটু স্নেহের পরশ ছুঁইয়ে দিলেন।

"ওই অন্য অন্য দেখতে অক্ষরগুলো আজ রাতে তোকে শিখিয়ে দেব। আর ছড়া ভালো লাগলে মুখস্থ বলবি, না লাগলে পড়লেই হবে। অন্যদের অত দেখতে নেই মা।"

মেয়ে কিছু কথা শুনল, কিছু কথা আর তার কানে গেল না।

"মা, দেখ আমার সাদা গোঁফ!" ঘন দুধের ফেনা ঠোঁটের উপরে লাগিয়ে নিয়ে গোঁফ বানানোয় একটা আলাদা আনন্দ পায় নীহা।

"পাগলি একটা। এবার স্কুলের সব পড়া শেষ করে ফেল।"

"এখন সাতটা দশ। তাই তো!"

"বাহ!"

নীরা খুব দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। সকালের সমস্ত কাজ গুছিয়ে করা, তারপর খামার বাড়িতে গিয়ে নানান সব্জির চারাগাছগুলোতে জল দেওয়া, সব সকাল ছটার মধ্যে মিটিয়ে ফেললে তবেই নীরা ওর একটুকরো মুক্ত বাতাসকে ঘরে ঢোকাতে পারবে। এমনটাই ওর শাশুড়িমার হুকুম। তাঁর হুকুমের নড়চড়ের কোন উপায় নেই ওর এই সংসারে।

নীরা নিচতলার বসার ঘরে যখন নেমে এল তখন সেই ঘর ভর্তি করে বসে আছে এক দল ছাত্র ছাত্রী। এটাই নীরার একটুকরো মুক্ত বাতাস। শাড়ীর আঁচলে নিজের হাতটুকু মুছে নিয়ে ওদের পড়াতে সকলের মধ্যমনি হয়ে বসল। নীরা ও ওর স্বামী দুজনেই প্রাইভেট শিক্ষক। তবে মাস খানেক হল নীরার স্বামী বেশ কিছু দূরের একটা সরকারি অফিসে ক্লার্কের চাকরি পেয়েছে।

চাকরি পাওয়ার এক পক্ষের মধ্যেই শাশুড়িমার হুকুম এসেছিল, সংসারে এখন আর যখন খাওয়া পরার অভাব হবে না, বউমার ওই ছেলে পড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই।

সেইদিন নীরা কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ওর স্বামী বলেছিল, "তা হয়না মা। এই পড়ানো আমাদের শুধু পেশা নয়, শখ!"

এটুকুতেই বাড়ির কর্ত্রীর আগুন রঙা চোখ নীরা দেখেছিল, একটু ভিতু নীরা কেন জানে না সেদিন আর ভয় পায়নি ওই দৃষ্টিতে বরং খুশি হয়েছিল স্বামী তথা বন্ধুর অদৃশ্য ভরসার হাতে হাত রেখে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে নীরার কাজের তালিকা আরও দীর্ঘ হল। এখন নীরাকে ভোর সাড়ে চারটের পরিবর্তে পৌনে চারটের সময় উঠতে হয়। সংসারের অশান্তি ওর একেবারেই নাপসন্দ তাই সবই মেনে নেয়।

নীহারিকা বয়সে অনেকটা ছোট, সংসারের এইসব ব্যাপার ও বোঝে না। তবে কারণে অকারণে ঠাকুমার ওর মার প্রতি ঝাঁঝালো বাক্যগুলো ওর মনে বিশাল এক প্রাচীর তৈরি করতে থাকে। সেই প্রাচীর ঠাকুমা নাতনির চিরাচরিত স্বাভাবিক মিষ্টি সম্পর্কের মাঝেই নির্মিত হয়ে চলে। নীরা চেষ্টা করে অনেক এই খুঁটিনাটির প্রভাব যাতে ওই ছোট্ট মেয়ের উপর না পড়ে, কিন্তু বাড়ির অন্যেরা সেটা ঠিক বোঝে না।

**

"কি রে আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কেন?"

"না, ভালো লাগছে না আর খেলতে"

নীরা হাতের কাজ ফেলে মেয়েকে একটু আদর করে আবার বলল, "কী হয়েছে মা?"

এবার ঠোঁট ফুলিয়ে নীহা বলল, "ওরা আমায় খেলতে নেয় না মা, আমাকে খালি এলেবেলে করে দেয়"

"ওহ ! এই ব্যাপার? এতে কাঁদে না মা। যা, উপরে গিয়ে খেলা কর!"

মন খারাপ করে উপরে উঠে জানালার পাশে বসে টগরফুল দেখছে। মনে মনে খুব চাইছে, একটু বড় হতে। তাহলে অনেক এমনকিছুই ও করতে পারবে, এই যেমন অনেক জোরে দৌড়াতে পারবে, লম্বা লম্বা কালো চুল হবে। আর ওড়না মাথায় লাগিয়ে নকল চুল করতে হবে না। ব্যাগ নিয়ে ঘড়ি পরে বাইরে যেতে পারবে একাই! কত্ত মজা হবে তখন।

"নীহা। এই নীহা কোথায় আছিস?"

এই ডাকটা নীহার খুব চেনা, মেসোমশাই এসেছে। নীহার মাসির বাড়ি ওদের বাড়ির খুব কাছেই, তাই প্রায়ই মাসি মেসো আসে বা ওরা যায়। নীহাকে মাসি মেসো খুবই ভালবাসে। প্রায়ই মেসোর হাত ধরে ও বেড়াতে যায়, আর শাঁখ সন্দেশ খায়! কখনও কখনও পান্তুয়াও খায়। এগুলো খুব প্রিয়। ফেরার পথে মাসির কাছে সন্ধ্যের জলখাবারটা উপরি পাওনা।

আজ উপর থেকে নামতে নামতে মাসির গলা পেলো।

"দিদি, তুইও রেডি হয়ে নে। আজ ডাক্তার দেখিয়ে নিবি আর আমাদের সাথে একটু ঘুরেও আসবি!"

"মাসি, কে ডাক্তারের কাছে যাবে? মা? কী হয়েছে?"

"কিছু না সোনা। তোমার তো সর্বক্ষণের বন্ধু আসবে, তাই ডাক্তার কাকু দেখবে ওরা ঠিক আছে কিনা।"

নীহা ঠিক বুঝল না। ভ্রু কুঁচকে বলল, "কে আসবে?"

"তোর ভাই বা বোন হবে রে! সবসময় খেলবে তোর সাথে! সে এখন মায়ের পেটে অপেক্ষা করছে। তাই ডাক্তারের কাছে যাব। বুঝলি?"

"সত্যি! আমাকে আর কেউ এলেবেলে করলে আমি তো বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলে আসব! বাড়িতেই অনেক খেলা করব ওদের সাথে!" হাততালির মত করে দুই তালু একে অপরের সাথে ঠেকিয়ে বলল।

"বউমা!"

ঠাকুমার আওয়াজ শুনল নীহা। আর ওর মা, নীরা সাথে সাথেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আজ আমার বাতের ব্যাথাটা বেড়েছে। সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে পারব না।"

"আমার তো ডাক্তার দেখিয়ে ফিরতে সাতটা হয়ে যাবে! আচ্ছা আমি দেওরভাইকে বলে দিচ্ছি ওই একটু সন্ধ্যা বাতি জ্বেলে দেবে।"

"কি! বাড়ির বউ থাকতে বাড়ির ছেলেরা! এমন অমঙ্গলের কথা বল কি করে তুমি! ঠাকুর ঠাকুর, অপরাধ নিও না"

এহেন বাক্যবানে নীরা কেমন যেন চুপ হয়ে গেল। বুঝে উঠতে পারল না, একটা সাধারন আচার কেমন করে আর একজনের স্বাস্থ্য হতে বড় হতে পারে!

তবুও নীরা বলল, "আপনিই একটু বাতি জ্বেলে দেবেন, নয়ত আমি এসেই দেব। কিন্তু আজ না গেলে হবে না। একমাসের চেষ্টায় ওরা অ্যাপয়েনটমেন্টটা পেয়েছে"

নীরা এরপর আর ওই ঘরে দাঁড়ায়নি। তবে গুজগুজানি ঠিকই কর্নকুহুরে প্রবেশ করল।

**

দুই দিন পর

"দেখে যাও, বাড়ির বউ কেমন করে সকলের সহানুভূতি নিচ্ছে। সব লোক দেখানো। আমরা যেন পেটে ধরিনি। মহারানী এই প্রথম"

ঠাকুমার উচ্চ স্বর কানে গেল নীহার। নীরাদের বাড়ির জলের কল খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই আজ ও নিজেই জল ভরতে গিয়েছিল সরকারি টিউবওয়েল থেকে। বালতি ভর্তি জল আনায় যদিও ডাক্তারের মানা আছে তবুও এমন অনেক কাজই নীহার বাবা অফিস চলে গেলে ওর ঠাকুমা ওর মাকে দিয়ে করায়। নীরাও অশান্তি আর নিন্দার ভয়ে করে। আজ পর্যন্ত কিছু না হলেও আজ অসাবধানে ভর্তি বালতি নিয়ে আছাড় খেয়ে পরেছে। সেটা দেখে এসেই উপরোক্ত বাক্যবাণে বাড়ি মুখরিত করে তুলেছে ওর ঠাকুমা...

ও মায়ের কাছে যাবে বলে বাইরে বেরোচ্ছে, দেখল ওর ভালো দাদু আর সাথে আরও দু একজন বউরা মিলে ওর মাকে ধরে নিয়ে আসছে। যে মাকে ও কোনদিন কাঁদতে দেখেনি আজ তার দুই চোখ ব্যাথায় জলে ভরা ...

ভালো দাদু নীহারিকাদের প্রতিবেশী। সম্পর্কে ওর বাবার জেঠু হন উনি। উনিই ডাক্তার ডাকলেন, ওর বাবাকে খবরও দিলেন।

যদিও নীরা বা তার গর্ভের সন্তানের কিছু বিশেষ ক্ষতি হয়নি, কিন্তু নীহারিকার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল।

ও আর খেলার ছলেও বড় হতে চায় না। মাথায় ওড়না লাগিয়ে লম্বা চুলও বানায় না।

এখন ও একটা ছোট্ট খাতায় অনেক কিছু লিখে রাখে।

তারই একটা পাতায় লেখা, "আমি কখনও বড় হতে চাইনা। বড় হলে অনেক কাজ করতে হয়, ঠাকুমার বকা খেতে হয়। আমি সবসময় মায়ের ছোট্ট মেয়ে হয়ে থাকব। বড়রা সবসময় বলে হিংসা কর না, ঝগড়া কর না, কিন্তু এগুলো বড়রা কেন মানে না? তাই আমি বড় হব না কখনও। রোজ মায়ের আদর খাব। আর শাঁখ সন্দেশ খাব"

ঝোড় হাওয়ায় উল্টে যাওয়া খাতার পাতায় অক্ষর গুলো নীরা পড়ল। বাইরে হাওয়া বইছে, একটা নিঃশব্দ ঝড় ওর জীবনেও আসছে, অসময়ে বড় হয়ে যাওয়া ছোট্ট নীহাকে ওর সঠিক শৈশব দিতে হবে।

সবসময় চুপ থেকে ও যে সেটা করতে পারবে না ...

ভুলটা ভুল, লজ্জা, অশান্তি বা নিন্দার ভয়েও অন্যায়টাও কোনভাবে ন্যায় হতে পারে না। ■

বাড়ি

- দুহিতা সেনগুপ্ত

যে সব বাড়ির দিকে মাথা তুলে তাকাতে হয়, যেসব বাড়িতে অন্ধকারে একটা জানলা জুড়ে থাকে নীল মায়াবী আলো। যেসব বাড়ির দরজা লেপ্টে আগলে থাকে বোগেনভেলিয়ার দল। যে সব বাড়ির সদর দরজার ফাঁকে ফাঁকে গর্জন লিখে যায়, বারো বছরের জীব। যে সব বাড়ির অবসর থাকেনা, শুধু ঝুল বারান্দায় অবসরের ঝুলন গাঁথা থাকে। যে সব বাড়ির ছাদের বাগান, মালির শখের। যেসব বাড়ির ইটে ইটে কাঠা আর স্কোয়ার ফিট এর হিসেব লেখা। যেসব বাড়ি, এক বা একাধিক মানুষ ধরে, যেসব বাড়ির ঠিকানা থাকে।

এ সেই গোত্রের নয়।

সে এক ঘরের বাড়ি। দূর থেকে দেখে লাগে নীল পলেস্তারা ঢাকা, গাঢ় নীল। এত শক্ত ও সুঠাম ভাবে ঢাকা যে বাড়ির আকার বাইরে থেকেও স্পষ্ট। তবে জানলা, দরজা কোথায় কি ঠিক ঠাহর করা যায়না। বোঝা যায় একতলা। আজকালকার বেশির ভাগ কনস্ট্রাশনগুলোর মতো, সৌন্দর্যের খাতিরে অকারণ আকার বিকৃতি চড়াই উতরাই চোখে পড়েনা। শুরু থেকে খানিক আসার পরে একবার প্রস্থের সংকোচন, তারপর বাকিটা প্রায় এক প্রস্থের আয়তক্ষেত্র। দৈর্ঘ্যে বেশ খানিক। পলেস্তারা হঠাৎ সরে যায়। সরাতেই চোখে পড়ে, ঘরে একাধিক জানলা দরজা, চিমনি ও ডিটক্সিফিকেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় গাছগাছালি বর্তমান।

ছোটবেলা যেমন বাড়ি আঁকতাম, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কিছু উপাদান মোড়া একটা বাড়ি। দুটো জানলা, একটা দরজা, ছাদ, ছাদের থেকে রান্নাঘরের ধোঁয়া বহির্গমন পথ, পাশে একটা কলাগাছ ও তার তিনটে পাতা। দরজার ঠিক সামনে থেকে একটা রাস্তা এঁকে বেঁকে আঁকার খাতা ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানেনা।

এ বাড়ি ও ঠিক সেই ন্যূনতম প্রয়োজনের উপাদান নিয়েই। বাইরে থেকে ভেতরে একাধিক হাওয়া বাতাস চলাচলের পথ, দরজা ও দরজা সংলগ্ন বাগান। ছাদ, বাড়ির সংরক্ষণ এর মূল কারখানা, তাই তারও সঠিক যত্নমাফিক, শীত গ্রীষ্মের সরাসরি প্রকোপ এড়াতে, প্রয়োজন মতো গাছ গাছালি বা আগাছায় মোড়া।

এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যোগাযোগ রাখে দরজা- জানলারা। বাইরে ও ভেতরে তার প্রতিরক্ষার একাধিক প্রক্রিয়া বর্তমান।

দুটো জানলার ওপর যত্নে লাগানো কালো ঘাসের বেড়া, জানলার pane ধরে সাজানো sacculent।

বন্ধ করলেও ওই জানলা দেখা যায় যেন আমার জানলা দিয়ে।

প্রত্যেক বাড়ি একটা করে মানুষ ধরে,

আর প্রত্যেক মানুষ, নিজেদের কে বাড়ি ভেবে বসে।

একটা বাদামি রঙের একতলা বাড়ি। ফুটপাথের রেলিং ঘেঁষে একটা বালিশ আর একটা মাদুরের ওপর শুয়ে থাকে, প্রতি রাতে আপাদমস্তক নীল চাদর ঢেকে।

ওরা ঠিকই বলে, এ শহরে মাথা গোঁজার জায়গার অভাব হয়না। ■

Sketch by Sita Ray

অবয়বহীন দৈত্য

- পূর্ণিমা ঘোষ

তুমি অবয়বহীন, এ ধরাকে করেছো অধিকার
তুমি বহুরূপী রং বদলাও, তোমায় বোঝা ভার।
বাড়াচ্ছো তোমার শক্তি যত পাচ্ছো নানান নাম
আলফা- বিটা- গামা- ডেল্টা, এ কি আগে জানতাম ?

দাপিয়ে তুমি বেড়াচ্ছো, ভয়ে কাঁপছে সব দেশ
কাড়ছো জীবন, বন্দি সবাই, সব কিছু কি হবে শেষ?
মা বাবা হারা কত শিশু, রুজি হারা কত শত
কি যে হবে ? বাঁচবে কিসে ? ভেবে পায় না প্রতি নিয়ত।

হাত ধোয় সবে স্যানিটাইজারে, সব থানে তা বিরাজমান
মাস্ক মুখে আজ সবাই ঘোরে, এ ও তোমারই অবদান।
বাতাসে অক্সিজেন, তবু রুগী ভোগে প্রশ্বাসে
ডাক্তার নার্স পায় না ভেবে কষ্ট কমাবে কিসে ?

বন্ধ স্কুল, বন্ধ বাজার, বন্ধ সব লক ডাউনে ,
খেলার মাঠে খেলতে মানা, ছেলে মেয়ের কষ্ট মনে।
নির্বিবাদে ঘুরছো তুমি, বন্দি সবাই যে যার ঘরে
তোমার লীলায় অফিস বন্ধ, এ লীলা কে বুঝতে পারে ?

তোমার জন্ম -ইতি কেউ কি জানে ? মরে সবে তোমার ত্রাসে ;
বেশতো হলো, যাও না ফিরে, যাও তুমি তোমার দেশে।

ছেলেবেলার রথ

- সমীক ঘোষ

শুভ সকাল ভাই
সকাল সকাল তোর মেসেজটা পাই
আজ রথ, সেই ছেলেবেলার রথ।

পুরনো সেই দিনের কথা
এখনো যেন স্মৃতি তে গাঁথা,
আজ আবার সেই রথ টানার দিন।
ঘরের কোনো এক কোণে
খবরের কাগজে বা প্লাস্টিকে জড়ানো,
তিন তাক এর সেই রথ আজ বেরোবে রাস্তায়।
লাল নীল কাগজ, ফুল, মোমবাতি বা
চাইনিজ টুনি বাল্ব দিয়ে সাজানো রথে
জগন্নাথ দেব বেরোবেন বৈকালিক ভ্রমণে
বছরে এক দিন কলকাতা বেড়ানোর সুযোগ,
এরকম কি পাওয়া যায় রোজ রোজ?

ইস্কন না মাহেশ
হবে আজ কত রথের রেস
হাঁ করে দাড়িয়ে আছি বেশ
রথ দেখার অপেক্ষায় গড়িয়াহাট মোড়
নাহ একদম হচ্ছি না যে bore !
কলকাতার যত গলি পথ
বিকেল হলেই তাতে নামবে
অগণিত রঙিন রথ।
যদি বৃষ্টি না বাধ সাধে !

এখনো যদি বৃষ্টি আসে রথে
মনটা যেনো কাঁদে।
চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই
সারি সারি গোলাপী, হলুদ মঠ, ফুট করাই

আজ calorie control, দাতে ব্যাথা
এগুলো খাওয়া যেন আপদ বালাই।
সময় বদলেছে, অভ্যাস বদলেছে
বদলেছে চিন্তা ধারা
কিন্তু অনুভূতি গুলো
মাঝে মাঝে জাগে তারা
সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত
গায়ে কাঁটা দেওয়া স্মৃতি যত।

চল আজ মনে মনে রথ টানি ভাই।
সেই সংকীর্ণ গলি গুলো আজ ঘুরে বেরাই।
তেলে ভাজা আর মুড়ি খাই।
অনেক পেতে পারি ওই রাস্তায়।
আরে না না চাঁদা নয় রে হাদা
দেখতে চাই কিছু পুরনো মুখ
রোমন্থন করার সে যে কি সুখ

রথের দিনের অলীক কল্পনা
করে মনের মধ্যে আনাগোনা।
যাই কে যেনো ডাক দিল
Perhaps Duty calls এলো!
আমাদের জীবনের রথ ঠেলা শেষ হলে
চল টানবো আর একবার সেই ছেলেবেলার রথ।

বাবা

- সুব্রত বণিক

বাবার হাত ধরেই আমার
প্রথম চলতে শেখা,
বাবার হাতের আঙ্গুল ধরেই
প্রথম স্লেটে লেখা।
প্রথম যেদিন বাবার মত
স্লেটে "অ" লিখি,
বাবার চোখে ছিল জল
অবাক চোখে দেখি।
বাবার কাছেই প্রতিদিন
হোত আমার নাওয়া,
অফিস যাবার আগে বাবার
আমায় খাইয়ে যাওয়া।
অফিস ফেরত সন্ধ্যাবেলা
আমার জন্যে কিছু
আনতো বাবা, আমি তখন
নিতাম বাবার পিছু।
আদর করে বাবা যখন
নিত আমায় কোলে,
মা তখন অনেক কিছু
বাবাকে দিত বলে।
আমি যখন হলেম বড়
পেলেম রঙিন বই,
বাবার কাছেই প্রথম ছড়া
মুখে আধো ফোঁটা খই।
বাবার কোলে চড়েই আমার
প্রথম যাওয়া স্কুল,
সেদিন টবে ফুটেছিল
প্রথম বেল ফুল।

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে"
বাবার মুখে গান
শুনে শুনে বাবার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ার ভান।
বাবার চওড়া বুকের মাঝেই
আমার রাতের ঘুম,
বাবার কাছেই ছিল আমার
বায়নার যত ধুম।
বাবার কাছেই লেখাপড়া
বাবার সাথেই খেলা,
দেখতে দেখতে বেড়ে চলে
আমার ছেলেবেলা।
আমি যখন রাত জেগে পড়ি
বাবা রয় জেগে পাশে,
আমার পড়া দেখে বাবা
মুখ টিপে শুধু হাসে।
এখনও তো বাবা আমার
থাকে সদাই পাশে,
ভুলগুলি সব শুধরে দেয়
বুক ভরে বিশ্বাসে।
বাবাকেই যে বলতে পারি
মনের যত কথা,
বাবাই যেন বুঝতে পারে
মনের যত ব্যথা।
বাবাই আমার বন্ধু প্রিয়
আমার মনের মানুষ,
বাবাই এঁকে দিয়েছে মনে
স্বপ্নের রঙিন ফানুস।
বাবার কথা - "ঘুমিয়ে তুমি
স্বপ্ন দেখো না,
স্বপ্ন দেখো জিনিস এমন
যা ঘুমোতে দেয় না।
আজ তুমি হয়েছো যা
তাই গতকালের জন্য,
আজ যা করবে তুমি
আগামীতে পাবে তা মান্য।"
বাবা যেন এমনি করেই
আগলে আমায় রাখে,
সারা জীবন বাবা যেন
পাশে আমার থাকে।
বাবা আছে বলেই আমার
নিশ্চিন্তে পথ চলা,
সারা জীবন জড়িয়ে যেন
থাকি বাবার গলা।

দুই পৃথিবী

- বিশ্বনাথ পাল

তোমার পৃথিবী রঙিন আলোয় মোড়া
আমার পৃথিবী আজও অন্ধকারে,
তোমার পৃথিবীতে মদিরার ফোয়ারা
আমার পৃথিবী..... ধুঁকছে অর্ধাহারে।

তোমার পৃথিবী ফ্যাশন টিভির চ্যানেল
আমার পৃথিবী ন্যাশানাল জিওগ্রাফি,
তোমার পৃথিবী মেকি মুখোশের খেল
আমার পৃথিবী খোলা আকাশের পাখি।

তোমার পৃথিবী হাওয়াই জাহাজে চড়ি
ছুটিতে চলেছে সমুদ্র সৈকতে,
আমার পৃথিবী......রিকশা ঠেলাগাড়ি
ঘর্ম শরীরে বইছে বোঝা পিঠে।

তোমার পৃথিবী পাঁচ তারা রেস্তোরা
আমার পৃথিবী পথের সস্তা ধাবা,
তোমার পৃথিবী স্বাদে-গন্ধে ভরা
আমার পৃথিবী সয় শোষণের থাবা।

তোমার পৃথিবী ক্যান্সারেতে ভোগে
আমার পৃথিবী মরছে ডেঙ্গু জ্বরে,
তোমার আছে ওষুধ পথ্য রোগে
আমার পৃথিবী নিঃস্ব পথের মোড়ে।

তোমার পৃথিবী গুচ্চি আরমানী
আমার পৃথিবী সস্তা সুতির বেশ,
প্রথম পৃথিবী তোমার নিবাস জানি
তৃতীয় বিশ্ব..... আজও আমার দেশ।

কোনো এক কুরূপাকে

- কৌশিক ভট্টাচার্য্য

ভালোবাসার দাম জানো কি কত?

অনেক কিছু পাও নি এ জীবনে।

আজ বুঝেছি একলা কেন অত

ভালোবাসার দাম জানো কি কত?

এখনো ঘাস ঘুঘু-বুকের মত

দুললে হাওয়া মিষ্টি ছোঁয়া মনে

ভালোবাসার দাম জানো কি কত?

অনেক কিছু পাও নি এ জীবনে।

(Frances Cornford-এর To a Fat Lady Seen from the Train অবলম্বনে)

নতুন ভোর

- শান্তনু চক্রবর্তী

ভোরের আলো ধূসর যে আজ, বেসুর মনোবীণা,
শূন্যতা আজ করছে যে গ্রাস, কায়া উদ্দ্যমহীনা!
শূন্য যে আজ চেনা সেই খাট, শূন্য হৃদয় খাঁচা,
এক মৃত্যু করছে প্রমাণ, দুঃসহ কত বাঁচা।

স্মৃতির পাতাও নড়তে নারাজ, দুঃখ সর্বগ্রাসী,
সদাহাস্য অবয়ব হতে মুছে গেছে আজ হাসি!
বজ্রকঠিন সংকল্পে কর্তব্যের আহ্বান,
বাস্তবের জমিতে নেই কোমলতার স্থান।

সান্ত্বনা সে করছে না কাজ, মন নাগালের বাইরে,
ভিড়ের মাঝেও একাকিত্বের আগুন জ্বলে ভাই রে!
কথা গুলো কানে সেঁধোয়, হৃদয় দ্বারে তালা,
কথার বাহুল্যে তে যে তাই কান হয় ঝালা পালা।

এমন সময় আলোর ঝিলিক, অন্তরেরই মাঝে,
অনন্ত আশীষের পাহাড়, মাথা তোলে সাঁঝে!
জাগিয়ে তোলে সুপ্ত হিয়া, কোমল পরশ দিয়ে,
সাঁঝের আকাশ ঝলমল, বিষাদেরই মাঝে।

কর্তব্য তো চরিত্রেরই উজ্জ্বল এক বর্ণ,
সুখস্মৃতি'র লাজ রাখতে করবো তা সম্পূর্ণ !
জীবন খাতা'র নতুন পৃষ্ঠে, বলিষ্ঠ এই হাতে,
লিখব নতুন লিপি, যখন আশীষ আছে সাথে !!

নির্বিকার

- অরুণ গুপ্ত

রোজ দু'বেলা নিয়ম ক'রে
জপি রে ইষ্ট নাম
ভোগান্তির নেই যে শেষ
দিচ্ছে না ভাই কাম।
আবার আসছে দুর্গা পূজো
ডাকবো মাকে নিষ্ঠা ভরে
দুঃখ কষ্ট ভোগান্তিতে
আর যেন কেউ না ডরে।
বলতে পারেন এমন কেউ
ঈশ্বর কেন নির্বিকার
আর কতদিন চলবে এমন
বাঁচার জন্য হাহাকার?
আগমনীর বার্তা শুনে
কৃষ্ণ মেঘ দেয় চম্পট
আকাশ বলে মাখব গায়ে
শুভ্র মেঘ চটপট।
মেঘের এমন রকমফের
বড়ই উপভোগ্য
তার সঙ্গে আগমনীর
সঙ্গতটাও যোগ্য।
খুশির ছবি জীবনজুড়ে
নেই তুলনা যার
সবাই ভাবে মা দুর্গা
শুধুই হবে আমার।

নায়াগ্রা

- সুমনা কর

আজ ত প্রথম নয়,
দেখেছি তোমায় আমি সেই কত যুগ ধরে।
কত ব্যথা, কত কান্না, কতশত আনন্দধারা
ঝরেছে ওই বক্ষফুড়েঁ।

বারো হাজার বছরের সৃষ্টি সুখ হতে
নিরন্তর বয়ে চলা সেই তুমি
ছিলে অনুভবে।
এ-বই, সে-বই
খবরে-কাগজে, পাতায়-পাতায়
তোমাকে ছুঁতে চাওয়া আমি,
যুগ যুগ ধরে দেখেছি ওই রূপ।
ছুটেছি আমি।

আজ মনে পড়ে,
সেই যে শিশু মায়ের কোল ছাড়া,
নিষ্পাপ সে চোখে মুখে
নায়াগ্রা হয়ে বয়ে গেছ কতবার
দেখেছি আমি।

স্কুল ছেড়ে কলেজের পথে
উদ্দাম, উচ্ছল তারুণ্যের
গা-জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে,
ভিড়ে মিশে যাওয়া
অষ্টাদশী প্রেমিকের করুন চোখে সে ছায়া
দেখেছি আমি।

প্রবাসের পথে যেতে যেতে
কখনো সে স্রোত উথলে উঠেছে
জননীর বুকে
দেখেছি আমি।

অভিমানে অভিসারে
স্নেহের পরশ পারে
এসেছ তুমি বারে বারে
নায়াগ্রা হয়ে নেমেছ তুমি
দু চোখ জুড়ে,
দেখেছি আমি।

আজ এই মিলন ক্ষণে
মিলিয়ে নিলেম
সে সবটুকু
পাওয়া না পাওয়ার
হিসেবের স্রোত।।

Sketch by Sita Ray